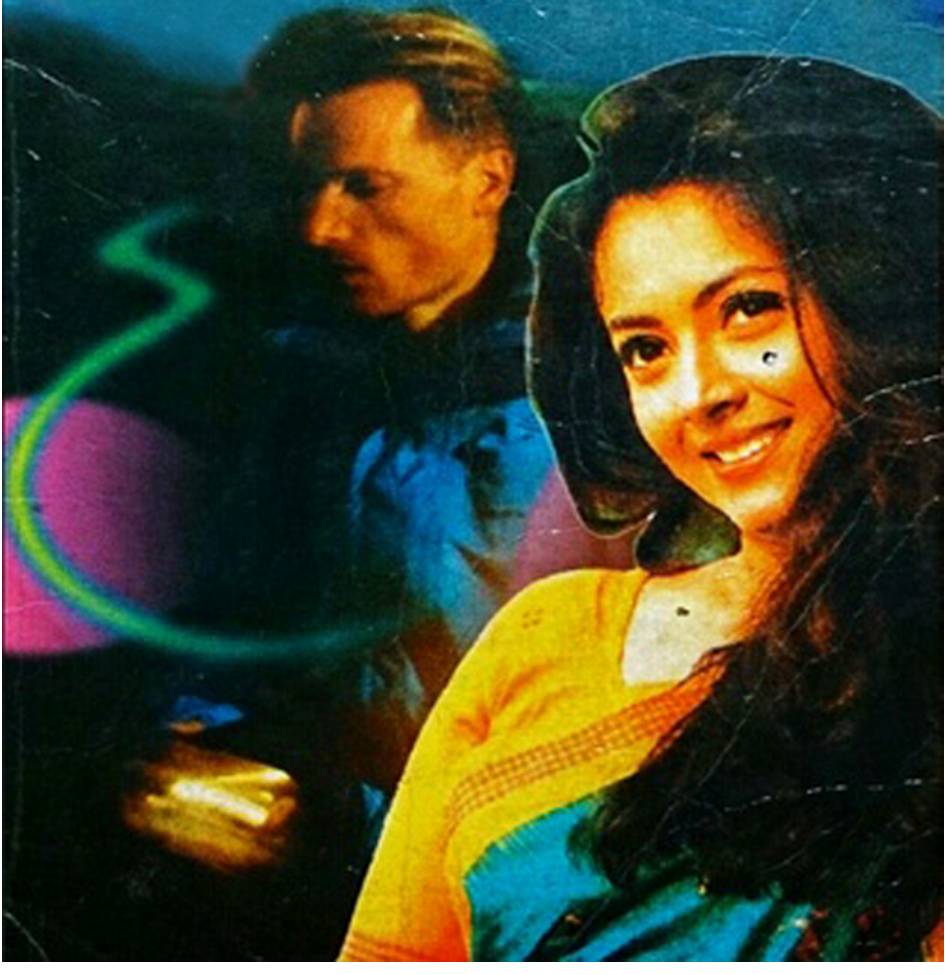
দস্যু বনহুর

রোমেনা আফাজ



প্রকাশক ঃ
মোঃ মোকসেদ আলী
সালমা বুক ডিপো
৩৮/২, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

নতুন সংস্করণ ঃ অক্টোবর ১৯৯৭

গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষণে প্রকাশক

মূল্য ৪৫টাকা

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ
বিশ্বাস কম্পিউটার্স
৩৮/২-খ, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০।

মুদ্রণে ঃ
সালমা আর্ট প্রেস
৭১/১, বি. কে. দাস রোড,
ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০।

উৎসর্গ

আমার প্রান প্রিয় স্বামী, যিনি আমার লেখনীর উৎসাহ ও প্রেরনা জুগিয়েছেন আল্লাহ রাব্বিল আলামিনের কাছে তাঁর রুহের মাগফেরাৎ কামনা করছি।

রোমেনা আফাজ
জলেশ্বরী তলা
বগুড়া

প্রাচীর টপ্‌কে পালাতে হত। বনহুর শুধু একটি শিস দিত, সঙ্গে সঙ্গে তাজ গিয়ে হাজির হত তার পাশে। বনহুর প্রাচীরের ওপর থেকে লাফিয়ে পড়তো তাজের পিঠে। তারপর আর কে পায় তাকে!

তাজের লাগাম ছিল না! বনহুর তাজের কাঁধের কেশ ধরে উবু হয়ে থাকে, তাজ ছুটতো হাওয়ার বেগে।

❑

তাজের পিঠে ছুটে চলেছে বনহুর।

প্রান্তরের বুক চিরে গহন বনে প্রবেশ করলো বনহুরের অশ্ব। এবার তার গতি কিছুটা মন্থর হয়ে এলো। গহন বনের মধ্য দিয়ে সরু একটা পথ ধরে ছুটতে লাগলো তাজ। ভোরের আলো তখন গহন বনকে অনেকটা হাল্কা করে এনেছে।

বনের মধ্যে বহুকালের পুরানো এক রাজপ্রাসাদ। কালের কঠোর নিষ্পেষণে আজ সে প্রাসাদ শুধু ইটের স্তূপে পরিণত হয়েছে। এককালে সেখানে যে বিরাট এক রাজবাড়ি ছিল অনুমানে তা বুঝা যায়। আজ সে প্রাসাদের গায়ে বিরাট বিরাট অশ্বত্থ বৃক্ষ জন্মেছে। আগাছায় ভরে উঠেছে প্রাসাদের অন্তপুর। সেটা যেন ঐ ভগ্নপ্রাসাদের নিকটে এসে আরও ঘন হয়েছে।

বনটা ছিল শহর ছেড়ে অনেক দূরে। তাই কোন লোকজন এ বনে কোনদিন প্রবেশ করত না। শিকারীরা মাঝে মাঝে শিকারে আসত বটে, কিন্তু তারা বনের খুব ভিতরে প্রবেশ করার সাহস পেত না। কাজেই ভগ্নপ্রাসাদটি ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে।

সেই ভগ্নপ্রাসাদের সম্মুখে এসে বনহুরের অশ্ব থেমে ছিল। লাফিয়ে নেমে দাঁড়ালো বনহুর। সঙ্গে সঙ্গে দু'জন লোক এসে তাজকে ধরল। বনহুর ভগ্নপ্রাসাদের একটা দরজা লক্ষ্য করে এগুতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ করল বনহুর, অমনি দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বাইরে থেকে তখন দেখলে মনে হবে, যেন একটা পাথরখণ্ড বা একটা মরচে ধরা লৌহপাত।

বনহুর দরজার ওপাশে পৌছতেই দু'জন সশস্ত্র দস্যু সসম্মানে সরে দাঁড়ালো।

বাইরে থেকে রাজপ্রাসাদটাকে ভগ্নস্তূপ বলে মনে হলেও আদতে ভিতরটা তার ভগ্নস্তূপ ছিল না। সুন্দর ঝক্‌ঝকে একটা রাজবাড়ি বলেই মনে হত। বাড়ির ভিতরের পথগুলো সাদা মার্বেল পাথরে গাঁথা। উঠানে সুন্দর সুন্দর ফোয়ারা, তার চারপাশে ফুলের বাগান।

বনহুর সে পথ ধরে সোজা এগিয়ে চলল। কিছুদূর এগুতেই সম্মুখে বিরাট বাঘের মুখের আকারে পাথরের মুখ হা করে রয়েছে। বনহুর বাঘের একটা দাঁতে পা দিয়ে চাপ দিতেই বাঘের জিভটা ভিতরে ঢুকে গেল, সেখানে দেখা গেল একটা সুড়ঙ্গ পথ, সে সুড়ঙ্গপথে দ্রুত এগিয়ে চলল সে।

মাটির নিচে রাজপ্রাসাদের মত আর একটা বাড়ি। পাশাপাশি কয়েকটা কক্ষ। প্রত্যেক কক্ষে বেলওয়ারী ঝাড় ঝুলছে। ঝাড়ের মধ্যে অসংখ্য মোমবাতি জ্বলছে।

মাঝখানের বড় একটা কক্ষে এক বৃদ্ধ শায়িত। শয্যাশায়িত ব্যক্তি যদিও বৃদ্ধ, তবু তার চেহারা বলিষ্ঠ। মস্তবড় গোঁফ, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, কানে বালা। হাতে বালা। লোকটা অসুস্থ, মাঝে মাঝে সে কোঁকিয়ে উঠছিল। চোখের রঙ ঘোলাটে হয়ে এসেছে। মাংসপেশীগুলো যদিও শিথিল হয়ে এসেছে, তবু দেখলে বুঝা যায়, এককালে তার শরীরে ছিল অসীম শক্তি। শয্যাশায়িত বৃদ্ধ দস্যু কালু খাঁ।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করলো।

পদশব্দে মুখ তুলে তাকালো কালুখাঁ—কে, বনহুর?

হ্যাঁ বাপু। এগিয়ে এলো সে কালু খাঁর পাশে।

কালু খাঁ হাত দিয়ে নিজের বিছানায় একটা অংশ দেখিয়ে বলেন—বস্ বাছা।

বনহুর বসে ছিল কালু খাঁর পাশে, বৃদ্ধের একখানা হাত মুঠায় চেপে ধরে বলেন—বাপু, এখন তোমার কেমন লাগছে?

বৃদ্ধ ঘোলাটে চোখে বনহুরকে ভাল করে দেখার চেষ্টা করে বলেন—বনহুর, আমি আর বাঁচবো না।

বনহুরের চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে— বাপু, আমি তোমার জন্য ভাল ডাক্তার নিয়ে আসব।

না বনহুর, ডাক্তারের আর প্রয়োজন হবে না। একটু থেমে পুনরায় ডাকে কালু খাঁ—বনহুর।

বল বাপু।

বৃদ্ধ কালু খাঁ ভয়ানক হাঁফাচ্ছিল! ঘেমে নেয়ে উঠেছে তার সমস্ত শরীর, অতি কষ্টে বলে সে—বনহুর, আজ বিদায়ের দিনে তোকে একটা কথা বলবো, যা এতদিন বলি বলি করেও বলা হয়নি।

বাপু, তুমি সুস্থ হয়ে ওঠো, আমি সব শুনবো।

না না, তা হবে না, আজ না বললে হয়ত আর কোনদিন বলা হবে না।

বনহুর কালু খাঁর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—বাপু, তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?

না রে না, কোন কষ্ট হচ্ছে না। বনহুর, একটু পানি দে দেখি বাছা।

বনহুর পাশের সোরাহী থেকে এক গেলাস পানি এনে কিছুটা পানি ঢেলে দিল কালু খাঁর মুখে।

বৃদ্ধ পানি খেয়ে তৃপ্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বলেন—বনহুর, সরে আয়, আরও কাছে সরে আয়।

বনহুর আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে বলেন—এই তো আমি তোমার পাশে বাপু।

বৃদ্ধ কালু খাঁ বলে ওঠে—বনহুর, আমি তোর বাপু নই। আমি তোর বাপু নই বনহুর। বৃদ্ধ কালু খাঁ হাঁফাতে হাঁফাতে বলে—তোকে আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। সে প্রায় বিশ বছর আগে—বালিশের তলা থেকে একটা মালা বের করে বনহুরের হাতে দেয়—বিশ বছর আগে যখন তোকে কুড়িয়ে পাই, তখন এই মালাছড়া ছিল তোর গলায়। দেখ বনহুর, এই মালা তুই চিনতে পারিস কিনা?

বনহুর মালাছড়া হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে থাকে, হঠাৎ তার আংগুলের চাপে লকেটের ঢাকনা খুলে যায়। কি আশ্চর্য! লকেটের ভিতর তারই ছোটবেলার ছবি। পাশের ঢাকনায় আর একটা ফুটফুটে বালিকার ছবি, পাশাপাশি দু'খানা মুখ। বনহুর তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে লকেটের ছবি দু'খানার দিকে। ধীরে ধীরে তার মানসপটে ভেসে ওঠে বিশ বছর আগের একটা দৃশ্য....

তরঙ্গায়িত নদীবক্ষে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে একটা নৌকা। দু'জন মাঝি দাঁড় টানছে, একজন মাঝি বসে আছে হাল ধরে। নৌকার সম্মুখ পাটাতনের ওপর পাশাপাশি বসে খেলা করছে একটা বালক আর একটা বালিকা। বালকের বয়স আট-নয় বছর, আর বালিকার বয়স ছয়-সাত। বালক ছবি আঁকছিল। বালিকা রুল দিয়ে ছবির ওপর আঁচড় কেটে ছবিটা নষ্ট করে দেয়। বালক অমনি মুখটা গম্ভীর করে ফেলে। বালিকা

নিজের ভুল বুঝতে পেরে দুঃখিত হয়, বিনীত কণ্ঠে বলে—রাগ করলে? ভুল হয়েছে, মাফ করে দাও মনির ভাই।

বালক খাতাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নদীর জলে, তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—দোষ করে মাফ চাইলেই বুঝি মাফ পাওয়া যায়.. বালক আর বালিকা মিলে এমনি ঝগড়া চলছে।

নৌকায় ছৈ-এর মধ্যে বসে রয়েছেন দু'জন মহিলা, তাদের অনতিদূরে একজন ভদ্রলোক বসে বসে বই পড়ছেন। ভদ্রলোক বালকের পিতা চৌধুরী মাহমুদ খান। আর ভদ্র মহিলাদের একজন বালকের আম্মা মরিয়ম বেগম, দ্বিতীয় মহিলা চৌধুরী মাহমুদ খানের বোন রওশন আরা বেগম। বালিকা রওশন আরা বেগমের কন্যা—নাম মনিরা, আর বালকের নাম মনির।

ননদের কন্যার নাম সখ করে মরিয়ম বেগমই রেখেছিল— মনিরা বেগম। ভিতরে ভিতরে ছিল তাঁর এক গোপন বাসনা। নিজের পুত্র মনিরের নামের সঙ্গে মনিরা নাম মিল করে রাখাই ছিল তার উদ্দেশ্য।

দেশের বাড়িতে বেড়াতে এসে শিশু কন্যাটিকে কোলে তুলে নিয়ে বলেছিল মরিয়ম বেগম—রওশন আপা, একটা কথা বলবো?

রওশন আরা বেগম বলেছিল—বলো।

মরিয়ম বেগম বলেছিল—আমার পুত্রকে তোমায় দিলাম, তোমার কন্যাটিকে আমি চাই কিন্তু।

আনন্দের কথা। আমার মেয়ে নিয়ে তুমি যদি সুখী হও এ তো আমার পরম সৌভাগ্য।

তারপর মনিরার এক জন্ম উৎসবে মরিয়ম বেগম দু'ছড়া মালা তৈরি করে পুত্র এবং ননদের কন্যাকে উপহার দেন। সে দিন ভাবী আর ননদের মধ্যে কথা নেয়া-দেয়ার পালা শেষ হয়ে যায়। হেসে বলেছিল মরিয়ম বেগম—এই মালা পরিয়ে দিয়ে আমি কথা পাকা করলাম, মনিরের সঙ্গে বিয়ে দেব মনিরার। সে মালা ছড়াই আজ বনহুরের হাতে। নীরব নয়নে তাকিয়ে আছে সে সম্মুখের দিকে—একটার পর একটা দৃশ্য ভেসে উঠছে তার মনের কোণে। যদিও অস্পষ্ট তবু বেশ মনে আছে, মায়ের সে কথার পর কিছুদিন যেতে না যেতে একদিন মনিরার আব্বা মারা গেল। খবর পেয়ে তার আব্বা চৌধুরী মাহমুদ খান স্ত্রী মরিয়ম বেগম ও পুত্র মনিরকে নিয়ে দেশের বাড়ি গেল। ফিরে আসার সময় শোকাতুরা বোনকে নিয়ে চলেন সঙ্গে করে।

নৌকা চলছে... সন্ধ্যার অন্ধকার ক্রমে ঝাপসা হয়ে আসছে। মনির আর মনিরার ঝগড়া থেমে গেলেও রাগ পড়েনি। মনির উঠে গিয়ে পিতার পাশে বসলো। চৌধুরী মাহমুদ খান হেসে বলেন—এত গম্ভীর কেন মনির? মনিরার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি?

গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে মনির—আমি ছবি আঁকছিলাম, মনিরা নষ্ট করে দিয়েছে।

হেসে বলেন চৌধুরী সাহেব-ও এই কথা। মা মনিরা, এদিকে এসো তো!

ভয়ে ভয়ে মনিরা গিয়ে দাঁড়ালো মামুর পাশে। চৌধুরী সাহেব তাকে আদর করে কোলে টেনে নিয়ে বলেন—তোমার মনির ভাইয়ের আঁকা ছবি নষ্ট করে দিয়েছ?

বালিকা মৃদুস্বরে বলে—ভুল হয়েছে মামুজান। আমি মনির ভাইয়ের কাছে কত করে মাফ চাইলাম, মাফ করলো না।

সে কি মনির, ভুল করে মনিরা যদি একটু ক্ষতি করেই থাকে, তবে কি তা ধরতে হয়? এসো মনি, বলো— তোমাকে আমি মাফ করে দিয়েছি।

মনির মনিরার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলে— দিলাম ওকে মাফ করে।

ঠিক সে মুহূর্তে নৌকাখানা দুলে উঠলো। মাঝিদের মধ্য থেকে একজনের গলা শুনা গেল—হুজুর ঝড় উঠেছে, ঝড় উঠেছে, হুশিয়ার— হুশিয়ার....

চৌধুরী সাহেব ছৈ-এর ভেতর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

আকাশের দিকে তাকিয়ে মুখমণ্ডল তাঁর ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো।

গোটা আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, তার সঙ্গে বইছে দমকা হাওয়া।

মনির এসে দাঁড়িয়েছে পিতার পাশে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রচণ্ড ঝড় শুরু হল। মনিরাকে বুকে চেপে ধরে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে লাগলেন রওশনআরা বেগম। মরিয়ম বেগম পুত্রের জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে ডাকাডাকি শুরু করলেন।

প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে নৌকাখানা মোচার খোলার মত দুলছে, চৌধুরী সাহেব চিৎকার করে মাঝিদের সাবধান হবার নির্দেশ দিচ্ছেন। অন্য কোনদিকে তাঁর খেয়াল নেই।

একে অন্ধকার রাত। তার ওপর প্রচণ্ড দাপট। মাঝিরা মরিয়া হয়ে নৌকাখানা সামলাতে চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নৌকাখানাকে রক্ষা করতে পারলো না তারা। নদীবক্ষে নৌকাখানা তলিয়ে গেল।

খোদার হয়ত রহম ছিল। অল্পক্ষণেই ঝড়ের বেগ কমে এলো চৌধুরী সাহেব বুঝতে পারলেন, তাঁদের নৌকা গভীর নদীতে ডুবে যায়নি। নদীর একেবারে কিনারে এসে ডুবেছিল।

মাঝিদের সাহায্যে চৌধুরী সাহেব সপরিবারে তীরে পৌছতে সক্ষম হলেন। কিন্তু একি, মনির কোথায়। চৌধুরী সাহেব মরিয়ম বেগম, রওশন আরা বেগম, মনিরা সবাই আছে—শুধু নেই মনির।

মরিয়ম বেগম বিলাপ করে কাঁদতে লাগলেন। চৌধুরী সাহেব অন্ধকারেই পাগলের ন্যায় ছুটাছুটি করতে লাগলেন, আর পুত্রের নাম ধরে চিৎকার করে ডাকতে লাগলেন।

এমন সময় ভোর হয়ে এলো। একমাত্র পুত্রের এই ভয়াবহ পরিণতির জন্য চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম পাগল-পাগলিনী প্রায় হয়ে ছিল। রওশন আরা বেগমও কেঁদেকেটে আকুল হলেন।

ওদিকে স্রোতের টানে বহুদূর ভেসে গিয়েছিল মনির।

নদীর কিনারে বালির ওপর অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে আছে সে। খোদার মহিমায় জীবন বেঁচে গেছে মনিরের।

এমন সময় নদীর কিনার ধরে এগিয়ে আসছিল দস্যু কালু খাঁ। হঠাৎ তার দৃষ্টি গিয়ে পড়ে মনিরের দিকে। দেখতে পায় সুন্দর ফুট-ফুটে একটা বালক পড়ে আছে বালির ওপরে। বালকটি মৃত না জীবিত দেখার জন্য কালু খাঁ বসে পড়ে তার পাশে। বুকে কান লাগিয়ে পরীক্ষা করে দেখে। যখন বুঝতে পারে বালক মৃত নয় জীবিত, তখন তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। একটা নতুন আশার আলো উঁকি দিয়ে যায় কালু খাঁর মনে। অতি যত্নে কাঁধে উঠিয়ে গহন বনের দিকে পা বাড়ায় সে....

কালু খাঁ অস্ফুট কণ্ঠে ডেকে ওঠে—বনহুর!

সম্বিৎ ফিরে পায় বনহুর; কালু খাঁর মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে—বাপু!

কালু খাঁ বলতে আরম্ভ করে—বনহুর, তারপর তোকে নিয়ে এসে আমি নিজের ছেলের মতই লালন-পালন করতে লাগলাম। দিন দিন বড় হতে লাগলি তুই। ভুলে গেলি তোর পিতামাতার কথা। একদিন ফিরে এসে দেখি, তুই বনের মধ্যে একটা ঝোপের পাশে খেলা করতে করতে ঘুমিয়ে

পড়েছিস। ভোরের সূর্যের আলো পড়েছে তোর মুখে। অপূর্ব সুন্দর লাগছিল তোকে। যেন শিশিরস্নিগ্ধ একটা ফুল। কতক্ষণ যে আমি তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিলাম জানি না, হঠাৎ আমার কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো একটা শব্দ 'বনহুর'!

বনহুর অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠে—বাপু!

হ্যাঁ, তারপর ধীরে ধীরে মনির মুছে গিয়ে তৈরি হলো আমার বনহুর। আমি তোকে খেলাধুলার মধ্যে দিয়ে অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা দিতে লাগলাম। একদিন দস্যু কালু খাঁ পরাজিত হলো বনহুরের কাছে। জয়ী হলো সে। সেদিন আমার দস্যু—জীবন সার্থক হলো, নিঃসন্তান কালু খাঁ পুত্ররত্ন লাভে সক্ষম হলো..... হঠাৎ অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে কালু খাঁ—হাঃ হাঃ হাঃ আমার সাধনা সার্থক হয়েছে। আমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে। দস্যু কালু খাঁ মরে গেছে.... দস্যু কালু খাঁ মরে গেছে। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দস্যু বনহুর। হাঃ হাঃ হাঃ, একদিন কালু খাঁর ভয়ে দেশবাসী প্রকম্পিত হয়ে পড়েছিল, আজ প্রকম্পিত হচ্ছে দস্যু বনহুরের ভয়ে। আমার সাধনা সার্থক হয়েছে, হাঃ হাঃ হাঃ হঠাৎ উঠে বসতে যায় কালু খাঁ, সঙ্গে সঙ্গে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। বনহুর দু'হাতে তুলে ধরে ডাকে.... বাপু... বাপু....

কিন্তু কালু খাঁ তখন চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে। বনহুর কালু খাঁর প্রাণহীন দেহটা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে আর্তনাদ করে ওঠে— বাপু... বাপু....

অমনি ছুটে এলো নূরী।

নূরী দস্যু কালু খাঁর পালিতা কন্যা। অবশ্য নূরীর পিতা দস্যু কালু খাঁরই একজন অনুচর ছিল। দস্যুতা করতে গিয়ে নিহত হয় নূরীর বাবা। সে হতে নূরী রয়ে যায় কালু খাঁর নিকটে।

বনহুর এই বনে খেলার সাথী হিসেবে নূরীকেই পেয়েছিল পাশে। বনহুরকে ভালবাসতো নূরী। কিন্তু বনহুরের মনে নূরী তখনও দাগ কাটতে পারেনি। বনহুর নিজকে নিয়ে নিজেই ব্যস্ত থাকতো।

নূরী ছুটে এসে কালু খাঁকে বিছানায় ঢলে পড়ে থাকতে দেখে আর্তনাদ করে ওঠে—বাপু! এ কি হয়েছে তোমার!

বনহুর বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে—নূরী, বাপু চলে গেছে। বাপু চলে গেছে....

বিলাপ করে ওঠে নূরী—বাপু চলে গেছে। হায়, একি হলো! একি হলো-----

বনহুর দু'হাতে মুখ ঢেকে ছোট বালকের ন্যায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

❑

আজ ক'দিন হলো কালু খাঁর মৃত্যু হয়েছে। ঘন বনের ছায়ায় কবর দেয়া হয়েছে তাকে। বনহুর দিনরাত সে কবরের পাশে বসে থাকে। এই গহন বনে সে যে ঐ একটা মানুষকেই ভালবাসতো। সে কোনদিন ভাবতে পারেনি— কালু খাঁ তার পিতা নয়। আজ বিশটা বছর ধরে বনহুর তাকেই চিনে এসেছে। জ্ঞান হবার পর থেকে দেখে এসেছে তাকে। তার যে কোন পিতা-মাতা ছিল, সে কথা ভাবতেও কষ্ট হতে লাগলো বনহুরের। সে যে শিক্ষা পেয়েছে সে শিক্ষা সভ্য সমাজের নয়, দস্যু কালু খাঁ তাকে নিজের মনের মত গড়ে তুলেছিল।

এহেন পিতৃসমতুল্য কালু খাঁর শোক সহসা ভুলা বনহুরের পক্ষে কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেদিন বনহুর কালু খাঁর কবরের পাশে বসে নীরবে চোখের পানি ফেলছিল। এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ায় তার পাশে। বনহুরের মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—হুর, বাপু চলে গেছে, তার জন্য সবসময় মন খারাপ করে কোন লাভ হবে না।

মুখ তুলে বনহুর—নূরী, আমি যে বড় একা।

এই তো আমি আছি তোমার পাশে।

নূরী!

চলো হুর, সমস্ত অনুচর তোমার প্রতীক্ষায় বসে আছে।

নূরী!

ভুলে যেও না হুর, তুমি দস্যুসন্তান।

না না, আমি দস্যু-সন্তান নই, আমি দস্যু-সন্তান নই....

সেকি! এসব তুমি কি বলছো হুর?

নূরী জানত—বনহুর কালু খাঁরই পুত্র, তাই সে অবাক হয়ে কথাটা বলেন।

বনহুর বুঝতে পারলো, কথাটা সে ভুল করেছে। কালু খাঁর হাত ধরে সে শপথ করেছে, কোনদিন সে কাউকে বলবে না, সে দস্যু কালু খাঁর পুত্র নয়। না না, সে দস্যু-সন্তান, সে দস্যু-সন্তান , উঠে দাঁড়ায় বনহুর, নূরীকে লক্ষ্য করে বলে— চলো নূরী, আজ হতে আমি ভুলে গেলাম সব।

❑

সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট বনহুর। সামনে কয়েকজন দস্যু দণ্ডায়মান। সকলেই অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত, বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে—আজ আমরা মধুনগরের জমিদার বাড়িতে হানা দেব। মধুনগরের জমিদার বাসব নারায়ণ অতি দুষ্ট, শয়তান লোক। শুনেছি, একটা পয়সাও সে ভিখারীকে দান করে না। আমি চাই তার অর্থ নিয়ে ধুলোয় ছড়িয়ে দিতে। তোমরা প্রস্তুত?

সমস্বরে বলে ওঠে দস্যু দল—হ্যাঁ সর্দার।

বনহুর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, তারপর বেরিয়ে আসে কক্ষ থেকে। সমস্ত দস্যু তাকে অনুসরণ করলো।

বনহুর কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতেই নূরী এসে দাঁড়ালো তার সামনে। একটা গোলাপ ফুল তার দিকে এগিয়ে ধরে বলেন সে— হুর, তোমার যাত্রা শুভ হউক।

বনহুর ফুলটা নিয়ে গুঁজে দিল নূরীর খোঁপায়, তারপর ওর চিবুক ধরে একটু নাড়া দিয়ে বলেন— আল্লাহ হাফেজ!

তাজের পিঠে চড়ে বসলো বনহুর, সঙ্গে সঙ্গে তাজ উল্‌কাবেগে ছুটে চললো, সমস্ত দস্যু অশ্ব ছুটিয়ে দিল তার পিছু পিছু।

গভীর রাত।

জমিদার বাসব নারায়ণ গভীর ঘুমে অচেতন।

অন্যান্য দস্যুদের নিয়ে জমিদার বাড়ির প্রাচীর টপকে অন্তপুরে প্রবেশ করলো। এক মুহূর্তে গোটা বাড়ি প্রকম্পিত হয়ে উঠলো। যে যেখানে যা পেল, লুটে নিতে লাগলো। বনহুর প্রবেশ করলো জমিদার বাসব নারায়ণের কক্ষে।

দুগ্ধফেননিভ বিছানায় বাসব নারায়ণ তখন সুখস্বপ্ন দেখছিল। বনহুর তার শয্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। রিভলবারের মৃদু আঘাত করে ডাকলো—নারায়ণ মশায়, উঠুন।

ধড়মড় করে উঠে বসে বাসব নারায়ণ। সামনে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল তার কণ্ঠ। যমদূতের মত কালো পোশাকে পরা বনহুরকে রিভলবার হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হৃদকম্প শুরু হলো তাঁর। শুষ্ক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো—কে তুমি, কি চাও?

বনহুরের চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠলো। গম্ভীর কণ্ঠে বলেন —দস্যু বনহুর!

জমিদার বাসব নারায়ণের আড়ষ্ট কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো অস্ফুট একটা শব্দ—দস্যু বনহুর!

হ্যাঁ।

কিন্তু, কি চাও আমার কাছে?

কি চাই জান না? টাকা—তোমার সমস্ত টাকা আমাকে এ মুহূর্তে দিয়ে দাও। নইলে এ দেখছো, এর এক গুলিতে তোমার টাকার মোহ ঘুচিয়ে দেব।

বাসব নারায়ণ থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে বনহুরের পায়ের কাছে বসে ছিল—বাবা, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। টাকা কোথায় পাবো?

কোথায় পাবে? এসো আমার সঙ্গে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। বনহুর দু'পা এগুতেই বাসব নারায়ণ ছুটে গিয়ে সিন্দুক জড়িয়ে ধরলো।

বনহুর এক ঝটকায় তাকে সরিয়ে দিয়ে সিন্দুক খুলে যত টাকা পয়সা, সোনা-দানা নিয়ে অন্তপুর থেকে বেরিয়ে এলো।

পরদিন গোটা শহরময় ছড়িয়ে ছিল দস্যু বনহুরের এ দুঃসাহসিক দস্যুতার কথা। পুলিশ মহলে পর্যন্ত ত্রাসের সঞ্চার হলো।

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন চিন্তিত হয়ে পড়েন। তাঁর বহু প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, কিছুতেই এ দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে সক্ষম হননি। তাঁর অভিজ্ঞ জীবনে এ যেন চরম পরাজয়।

পুলিশ সুপার মিঃ বশির আহমদ পর্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন, তিনি নিজেও বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। গোপনে প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ শঙ্কর রাওয়ের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং কেসটা তাঁর হাতে অর্পণ করেন। অনুরোধ জানিয়ে বলেন, মিঃ রাও, আপনি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে দেশবাসীকে রক্ষা করুন।

মিঃ আহমদের কথা রাখবেন বলে আশ্বাস দেন মিঃ রাও। তিনি ভরসা দিয়ে বলেন—আমি আপনার অনুরোধ রাখবো, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবো।

থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ রাও, আপনার ওপর আমার ভরসা রইলো। দেখুন এ ব্যাপারে আপনার যত টাকা-পয়সা এবং লোকজনের প্রয়োজন হবে পাবেন, পুলিশ ফোর্স সব সময়ের জন্য আপনাকে সাহায্য করবে।

মিঃ আহমদের গাড়ি বেরিয়ে যেতেই মিঃ রাওয়ের সহকারী গোপালবাবু এসে হাজির হলেন, মিঃ রাওকে লক্ষ্য করে বলেন— কি হে, ব্যাপার কি? হঠাৎ যে পুলিশ সুপারের আগমন?

একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বলেন মিঃ রাও—ব্যাপার নতুন নয়, পুরানো।

পাশের সোফায় বসে পড়ে বলেন গোপালবাবু—পুরোনো? তাহলেই সেরেছে, রোগ সারতে অনেক ঔষধের প্রয়োজন হবে।

ঠাট্টা নয়, শুনো গোপাল।

বল, সব শুনতে রাজি আছি।

দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের নোটিস নিয়ে পুলিশ সুপ্যারের আগমন হয়েছিল।

কি বললে, বনহুরকে গ্রেপ্তার? তুমি ঐ কেস হাতে নিলে নাকি?

না নিয়ে কি আর উপায় ছিল। পুলিশ সুপার যখন এসেছেন।

কিন্তু এ কথা ভেবে দেখলে না শঙ্কর, কোথায় দস্যু বনহুর, আর কোথায় তুমি। আজ পর্যন্ত পুলিশবাহিনী যার টিকিটি দেখতে পায়নি, তাকে গ্রেপ্তার করবে তুমি? যা খুশি করোগে, আমি কিন্তু ওসবের মধ্যে নেই।

গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠেন শঙ্কর রাও—কেউ যখন তার টিকিটি পর্যন্ত দেখতে পায়নি, সে কারণেই আমি এগুতে চাই। দেখতে চাই কে এই বনহুর, কেমন তার শক্তি। গোপাল শনো, আরও সরে এসো আমার কাছে।

এলাম বল।

গোপাল, গত পরশু রাতে জমিদার বাসব নারায়ণের বাড়িতে হানা দিয়ে দস্যু বনহুর সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেছে।

এ কথা আমি শুনেছি।

শুনো, সব কথা মন দিয়ে শুনো, তারপর যা হয় বল। আমি একটা বুদ্ধি এঁটেছি।

কি বুদ্ধি শুনি? হাতি ধরবার মত বনহুরকে গ্রেপ্তারের ফাঁদ পাততে চাও নাকি?

এক রকম তাই।

বল, তাহলে শুনি তোমার বুদ্ধির ফাঁদ কত মজবুত হবে?

শুনো, আমাকে পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনের নিকট যেতে হচ্ছে। কিছু সংখ্যক পুলিশ প্রয়োজন।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু তোমার বুদ্ধির কৌশল কিছুটা শুনাও। পুলিশ নিয়ে বনহুরের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করবে নাকি?

না না, তা নয়, কথা হচ্ছে আগামী শনিবারে রায় বাহাদুর শ্যামাচরণের তিন লাখ টাকা তাঁর দেশের বাড়ি থেকে শহরের বাড়িতে আনবে।

একথা তুমি জানলে কি করে?

জানতে হয় না, জেনেছি।

তার মানে?

মানে এই রকম একটা অভিনয় করতে হবে। আমি আজই একবার রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবো। তিনি যেন এই রকম একটা কথা সকলের মধ্যে রটিয়ে দেন এবং নিজের সই করা কয়েকটা কাগজ—যাক সব বলে আর কাজ নেই, পরে সব জানতে পারবে।

তবু একটু বল না?

তারপর কয়েকজন পাহারাদার সঙ্গে করে শ্যামাচরণ মহাশয়ের নায়েব দেশের বাড়ি থেকে মোটরে তিন লাখ টাকা নিয়ে রওনা দেব, কিন্তু আসলে তাদের কাছে কোন টাকা-পয়সা থাকবে না। দস্যু বনহুর জানবে তিন লাখ টাকা যাচ্ছে। এ সুযোগ কিছুতে নষ্ট করা যায় না, তখন নিশ্চয়ই সে গাড়িতে হানা দেবে।

খাসা বুদ্ধি তোমার!

হ্যাঁ, খাসা বুদ্ধি এঁটেছি গোপাল। যে গাড়িতে টাকা আসছে, সে গাড়িকে অনুসরণ করবে পুলিশ ফোর্স, সকলের হাতেই থাকবে গুলিভরা রাইফেল। অতি গোপনে থাকবে, যেন কেউ জানতে না পারে।

উঠে পড়েন মিঃ শঙ্কর রাও-গোপাল তৈরি হয়ে এসো, এক্ষণি বেরুবো।

হাই তুলে উঠে দাঁড়ায় গোপালবাবু—যাত্রা তোমার জয়যুক্ত হউক!

❑

বনহুর কক্ষে পায়চারী করছে। এক পাশে বিরাট একটা মশাল জ্বলছে। সম্মুখে দণ্ডায়মান তার অনুচরবৃন্দ। মশালের আলোতে দস্যু বনহুরের জমকালো পোশাক চক্‌চক্ করে উঠছে। বনহুরের আসনের সামনে একটা টেবিল, টেবিলে একখানা চিঠি খোলা অবস্থায় পড়ে আছে।

বনহুর কাগজখানা হাতে নিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—এ চিঠি কোথায় পেলে?

একজন দস্যু বলে ওঠে—সর্দার, একটা লোকের পকেট থেকে চিঠিখানা পড়ে গিয়েছিল, রহমান কুড়িয়ে এনে আমাকে দিয়েছে।

হঠাৎ বনহুর হেসে ওঠে হাঃ হাঃ করে। তারপর প্যান্টের পকেট থেকে ঐ রকম আর একখানা কাগজ বের করে ঐ কাগজখানার পাশে রাখে। তারপর ঐ দস্যুটিকে বলে—কাগজ দু—খানা পড়ো।

দস্যুটি কাগজ দু'খানা হাতে তুলে নিয়ে বলে ওঠে—একি সর্দার, দুটোতেই যে একই কথা লেখা রয়েছে!

চিঠি দুটোতে লেখা ছিল—

নায়েব বাবু, আমার তিন লাখ টাকার
প্রয়োজন। আগামী পরশু আমার গাড়ি
পাঠাবো। কয়েকজন পাহারাদার সহ
ঐ টাকা নিয়ে আপনি স্বয়ং চলে আসবেন।

—রায় বাহাদুর শ্যামচরণ।

দস্যুটি কাগজ দু'খানা পড়া শেষ করে আবার টেবিলে রাখে। আশ্চর্য। দু'খানা কাগজের লেখা একই লোকের।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলে—দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের এটা একটা নতুন ফন্দি। শুধু ঐ দুটি নয়, অমনি আরও অনেক চিঠি এখানে সেখানে গোপনে ছড়ানো হয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করে এমন লোক পৃথিবীতে আছে নাকি? যাক্ এবার তোমরা বিশ্রাম করোগে।

দস্যুগণ বেরিয়ে যায়। বনহুর নিজের বিশ্রামঘরে প্রবেশ করে।

এমন সময় নূরী এসে দাঁড়ায় সেখানে। মধুর কণ্ঠে ডাকে—হুর!

নূরী বনহুরকে আদর করে 'হুর' বলে ডাকতো।

বনহুর মাথার পাগড়িটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বলে— কি খবর নূরী?

—হুর, তোমার দেখাই যে পাওয়া যায় না। সারাটা দিন তুমি কোথায় কাটাও?

বনহুর বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে মৃদু হেসে বলে— সারাটা দিন আমি তোমার পাশেই থাকি, তুমি আমাকে দেখতে পাও না নূরী?

নূরী বনহুরের পাশে গিয়ে বসে, তার জামার বোতাম খুলতে খুলতে বলে—মিছে কথা। আমি অন্ধ বুঝি?

নূরী, বনহুর কি মেয়েছেলে, তাই.....

হুর, আমি যে বড় একা। এ গহন বনে তুমি ছাড়া আর আমার কে আছে? নূরীর কণ্ঠে বেদনা ঝরে পড়ে।

বনহুর অবাক হয়ে তাকায় নূরীর মুখে।

নূরী বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—এ বনে আসা অবধি আমি তোমাকে সাথীরূপে পেয়েছি, হুর। তুমিই যে আমার সব।

নূরী, তুমি আমাকে ধরে রাখতে চাও?

না, ধরে রাখতে চাইনে, কিন্তু.....

বুঝেছি, আবার যেন ফিরে আসি এ তো? হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে বনহুর—পাগলী আর কি!

না, আমি নই, তুমি পাগল। কিছু বুঝ না, বুঝতে চাও না। এখনও তোমার ছেলেমানুষি গেল না, হুর!

নূরী, এখন বিশ্রাম করবো। তুমি এখন যাও লক্ষ্মী মেয়ে।

বনহুরের কথায় নূরী অভিমানভরে উঠে দাঁড়ায়—আচ্ছা আমি যাচ্ছি। আর তোমাকে বিরক্ত করতে আসবো না।

খপ্ করে নূরীর হাত ধরে ফেলে বনহুর—রাগ হলো?

আমি রাগ করলে তাতে তোমার কি আসবে যাবে? ছেড়ে দাও আমার হাত।

নূরী, অভিমান করো না। একটু বিশ্রাম করেই আবার আমাকে বেরুতে হবে।

তার মানে, আবার এ রাতেই তুমি বেরুবে?

হ্যাঁ নূরী, আমার অনেক কাজ।

শুধু কাজ আর কাজ, আজ নাই-বা বেরুলে!

তা হয় না নূরী, বেরুতেই হবে।

নূরী ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

বনহুর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে ছিল বিছানায়।

❑

গভীর রাত। তাজের পিঠে চড়ে বসলো বনহুর। আজ শরীরে স্বাভাবিক সাজ, প্যান্ট-কোট-টাই, মাথায় ক্যাপ। পকেটে কিন্তু গুলিভরা রিভলবার।

গহন বন বেয়ে, নিস্তব্ধ প্রান্তরের বুক চিরে ছুটে চললো বনহুরের অশ্ব। প্রান্তর পেরিয়ে এক পল্লীতে এসে পৌঁছল বনহুর। এবার গতি অতি মন্থর করে নিল সে। শস্যক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললো। অদূরে দেখা যাচ্ছে ধবধবে সাদা রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের বাড়ি।

বনহুর এ বাড়ির সামনে গিয়ে অশ্ব থেকে নেমে দাঁড়ালো।

মিঃ শঙ্কর রাও মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিল। কি করতে কি ঘটে গেল! এত বড় ফন্দিটাও তাঁর টিকলো না। বরং বেচারা রায়ঘাহাদুর শ্যামাচরণ এত বড় একটা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। লজ্জায় ক্ষোভে মরিয়া হয়ে উঠলেন শঙ্কর রাও।

পুলিশ মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি হলো! মিঃ বশীর আহমদ পর্যন্ত বোকা বনে গেল! কারও মুখে যেন কোন কথা নেই।

সমস্ত পথে-ঘাটে-মাঠে, অলিগলিতে পুলিশ পাহারা রইলো। সন্দেহজনক কাউকে দেখলেই তারা তাকে গ্রেপ্তার করবে। পুলিশমহল থেকে ঘোষণা করে দেয়া হলো, যে দস্যু বনহুরকে জীবিত কিংবা মৃত অবস্থায় ধরে এনে দিতে পারবে, তাকে লাখ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে।

অর্থের লোভে যে যাকে সন্দেহ হলো, ধরে নিয়ে এলো থানায়। একদিন গভীর রাতে কয়েকজন পুলিশ রাস্তায় পাহারা দিচ্ছিলো, এমন সময় একটা পাগল ছেঁড়া জামাকাপড় পরে আবোল-তাবোল বকতে বকতে চলে যাচ্ছিলো। পুলিশের দৃষ্টি আড়াল হয়ে যাবে, এমন সময় দু'জন পুলিশ ধরে ফেললো তাকে—এ বেটা, কোথায় যাচ্ছিস?

পাগল লোকটা মাথা চুলকাতে আরম্ভ করলো। পুলিশদের সন্দেহ আরও বাড়লো, একজন লাঠি উঁচিয়ে বসিয়ে দেবে আর কি, এমন সময় একটানে মুখ থেকে দাঁড়ি আর গোঁফ খুলে ফেলে বলেন পাগল লোকটা—আমি পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশরা বেকুফ বনে গেল। লম্বা সেলুট ঠুকে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সকলে। হৃৎপিণ্ড তখন ধক্ ধক্ করতে শুরু করেছে ওদের। না জানি এর জন্য কপালে কি আছে, এত কষ্টের পুলিশের চাকরিটা না খোয়া যায়।

মিঃ হারুন হেসে বলেন—হ্যাঁ, এই রকম সতর্ক থাকবে। পাগল কিংবা ভিখারী বলেও কাউকে খাতির করবে না। কথা ক'টি বলে চলে গেল ইন্সপেক্টার।

এতক্ষণে পুলিশগুলো হ্যাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

নূরী একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে চিন্তিত মনে বসে আছে।

এমন সময় বনহুর এসে দাঁড়ালো তার পাশে। নূরীকে বিষণ্ন মুখে বসে থাকতে দেখে হেসে বলেন—কি এত ভাবছো বসে বসে?

তোমার যেন কোন ভাবনা নেই! এই দেখ দেখি। খবরের কাগজের একটা জায়গা মেলে ধরলো বনহুরের চোখের সম্মুখে—দেখেছো?

ওঃ তাই বুঝি এত ভাবনা? পরক্ষণেই হেসে ওঠে হাঃ হাঃ করে বনহুর, তারপর বসে পড়ে নূরীর পাশে।

নূরীর চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে দু'ফোটা অশ্রু। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন— তোমার কি জীবনের এতটুকু ভয় নেই?

ভয়! কিসের ভয় নূরী?

তোমাকে যে জীবিত কি মৃত ধরে দিতে পারবে, সে লাখ টাকা পাবে।

নূরী, আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমি নিজেকে নিজেই ধরিয়ে দিয়ে এক লাখ টাকা গ্রহণ করি।

ছি! তোমার এত টাকার মোহ?

টাকা? বনহুর টাকার পাগল নয় নূরী! সে চায় দুনিয়াটাকে দেখতে।

বেশ হয়েছে, অনেক দেখেছো, এবার মানুষ হবার চেষ্টা কর। কেন, আমি কি মানুষ নই?

মানুষ যদি হতে তবে এমন সব আজগুবি কথা বলতে না। থাক, চল দেখি এবার কিছু খাবে।

বনহুর উঠে দাঁড়ায়—উঁহুঁ, কিছু খাবো না, নূরী।

কোথায় যাবে এই ভর সন্ধ্যায়?

প্যান্টের পকেট থেকে কয়েক তোড়া নোট বের করে নূরীর সামনে ধরে—এগুলো মালিককে পৌঁছে দিতে।

তার মানে?

প্যান্টের পকেটে টাকার তোড়াগুলো রাখতে রাখতে বলে বনহুর—ঐ যে সেদিন রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের নায়েবের কাছ থেকে টাকাগুলো নিয়ে এসেছিলাম তা এখনও মালিকের নিকটে পৌঁছে দেয়া হয়নি।

তুমি আশ্চর্য মানুষ।

কেন?

টাকা আনলেই বা কেন, আবার ফিরিয়ে দেবারই কি প্রয়োজন আছে?

নূরী, বনহুর সব পারে। ছলনা বা কৌশলে বনহুরকে বন্দী করা এত সহজ নয়, সেটাই জানিয়ে দিলাম। আর অযথা বৃদ্ধ নায়েব মহাশয়কে বিপদগ্রস্ত করতে চাইনে। শ্যামাচরণ মহাশয় কিছুতেই এই তিন লাখ টাকা ছাড়বে না, বৃদ্ধ নায়েব বাবুকেই পরিশোধ করতে হবে, নয়তো হাজত বাস।

তাতে তোমার কি, যা হয় হউকগে।

তা হয় না নূরী, অযথা কাউকে কষ্ট দেয়া আমার ইচ্ছে নয়, আচ্ছা চলি, ভোরে ফিরে আসবো।

নিস্তব্ধ প্রান্তরে জেগে ওঠে বনহুরের অশ্ব-পদশব্দ। নূরী দু'হাতে বুক চেপে ধরে উঠে দাঁড়ায়, বুকের মধ্যে ধক্ ধক্ করে ওঠে, না জানি সে কেমনভাবে ফিরে আসবে।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণের বাড়ির পেছনে গিয়ে বনহুর তাজের পিঠ থেকে নেমে দাঁড়ালো, তারপর প্রাচীর টপকে প্রবেশ করলো অন্তঃপুরে। একে গভীর অন্ধকার, তার উপরে বনহুরের শরীরে কালো ড্রেস থাকায় অন্ধকারে মিশে গেল সে।

অতি সহজেই রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের কক্ষের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

কক্ষে ডিমলাইট জ্বলছে। বনহুর পকেট থেকে একটা যন্ত্র বের করে অল্পক্ষণের মধ্যেই জানালার কাঁচ খুলে ফেললো, তারপর প্রবেশ করলো কক্ষে।

খাটের ওপর রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ শায়িত। গোটা রাত অনিদ্রায় কাটিয়ে এতক্ষণে একটু ঘুমিয়েছেন। তিন লাখ টাকার শোক কম নয়, টাকার শোকে তিনি অস্থির হয়ে পড়েছেন। যত দোষ ঐ নায়েব বাবুর। তিনি না জেনেশুনে অপরিচিত একটা লোককে বিশ্বাস করলেন, এত টাকা ছেড়ে দিল তার হাতে। না, এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করতে হবে। বৃদ্ধ পুরানো নায়েব বলে খাতির করলে চলবে না, জেল খাটাবেন। কিছুতেই রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ তাঁকে রেহাই দেব না.... এতসব ভাবতে ভাবতে কেবলমাত্র ঘুমিয়েছেন।

বনহুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর গায়ে মৃদু আঘাত করে ডাকলো—উঠুন।

রায়বাহাদুর ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে তাকালেন সামনের দিকে। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করতে যাব, অমনি বনহুর রিভলবার চেপে ধরলো তার বুকে—খবরদার, চিৎকার করবেন না।

বনহুরের কালো অদ্ভুত ড্রেস, মুখে গাল পাট্টা রায়বাহাদুরকে আতঙ্কিত করে তুললো। তিনি একটা ঢোক গিলে বলেন—তুমি কে?

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল—দস্যু বনহুর!

রায়বাহাদুর রাগে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছিল, চিৎকার করে বলেন—তুমিই দস্যু বনহুর!

হেসে বলেন বনহুর—হ্যাঁ।

আবার কি জন্য এসেছো? আমার তিন লাখ টাকা নিয়েও তোমার লোভ যায়নি?

ভুল বুঝেছেন রায়বাহাদুর মহাশয়, আপনার টাকা নেইনি, আপনার নিকটে পৌঁছে দেবার জন্যই আপনার নায়েব বাবুর কাছ হতে নিয়ে এসেছি। কারণ আপনি যেভাবে টাকা নিয়ে আসার ব্যবস্থা করেছিলেন, সেভাবে আনাটা নিরাপদ নয়, তাই আমি------

ওঃ তাহলে তুমি টাকাটা অন্য কেউ লুটে নেবার পূর্বেই লুটে নিয়েছো, শয়তান কোথাকার!

দেখুন আমি শয়তান নই, শয়তানের বাবা। যাক বেশি বিরক্ত করতে চাইনে আপনাকে এ দুপুর রাতে। বুঝতেই পারছি আপনি এ তিন লাখ টাকার শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছেন। সে কারণেই আমি তাড়াতাড়ি এলাম, এ নিন আপনার টাকা। প্যান্টের পকেট থেকে তিন লাখ টাকার তোড়া বের করে রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের হাতে দিয়ে বলে—গুণে নিন।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়ের চোখে মুখে একরাশ বিস্ময় ঝরে পড়ে। একবার হস্তস্থিত টাকা আর একবার বনহুরের কালো গালপাট্টা বাঁধা মুখের দিকে তাকান তিনি। একি অবিশ্বাসের কথা, বনহুর তবে কি তাকে হত্যা করতে এসেছে? ভয়ে বিবর্ণ হয়ে ওঠে তাঁর মুখমণ্ডল।

বনহুর পুনরায় বলে ওঠে—নিন টাকা গুণে নিন। এক পা পাশের চেয়ারে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ায় সে।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ কম্পিত হাতে টাকার তোড়াগুলো গুণে নিলেন।

বনহুর বলেন—ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ, ঠিক আছে।

বনহুর এক টুকরা কাগজ আর কলম বাড়িয়ে ধরলো রায়বাহাদুর মহাশয়ের সামনে—একটা রসিদ লিখে দিন, আমি তিন লাখ টাকা বুঝে পেলাম।

শ্যামাচরণ কাগজ আর কলমটা হাতে নিয়ে লিখলেন।

বনহুর হেসে বলেন—নিচে নাম সই করুন।

শ্যামাচরণ মহাশয় নাম সই করে কাগজখানা বনহুরের হাতে দিল।

বনহুর কাগজখানা হাতে নিয়ে আর একবার পড়ে দেখলো, তারপর পকেটে রাখলো। রিভলবার উঁচিয়ে ধরে পিছু হটতে লাগলো সে, পর মুহূর্তে যে পথে এসেছিল সে পথে অদৃশ্য হলো।

এবার বনহুরের অশ্ব রায় মহাশয়ের দেশের বাড়ির সদর গেটে গিয়ে থামলো, অতি সতর্কতার সঙ্গে প্রাচীর টপকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করলো সে। নায়েব বাবুর কক্ষ সেদিন চিনে নিয়েছিল বনহুর, আজ সে কক্ষের দরজায় আঘাত করলো।

নায়েব বাবুর চোখে ঘুম নেই, তিন লাখ টাকা যেমন করে হউক তাকে পরিশোধ করতেই হবে, না হলে নিস্তার নেই। কিন্তু কোথায় পাবেন তিনি অত টাকা। মাথার চুল ছিঁড়ছেন তিনি বিছানায় শুয়ে শুয়ে ঠিক সে মূহূর্তে কক্ষের দরজায় মৃদু শব্দে নায়েব বাবু বিছানায় উঠে বসে বলেন—কে?

বনহুর পুনরায় শব্দ করে ঠুক্ ঠুক্ ঠুক্.....

এবার নায়েব বাবু শয্যা ত্যাগ করেন। দরজা খুলে দিয়ে সম্মুখে বনহুরকে দেখেই চিৎকার করতে যান, সঙ্গে সঙ্গে বনহুর চেপে ধরে তার মুখ—ভয় নেই, আজ টাকা নিতে আসিনি। রায় বাহাদুর মহাশয়ের নিকটে টাকা পৌঁছে দিয়েছি, এই নিন রসিদ।

বৃদ্ধ নায়েব কম্পিত হাতে রসিদখানা হাতে নিয়ে হাবা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন, তিনি বিশ্বাস করতে পারেন না এ কথা।

বনহুর যেমনি এসেছিল, তেমনি বেরিয়ে যায়।

রাতের ঘটনা নিয়েই পুলিশ অফিসে আলোচনা চলছিল। রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়কে দস্যু বনহুর সে তিন লাখ টাকা ফেরত দিয়ে গেছে, এটাই আলোচনার বিষয়বস্তু।

পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও, মিঃ গোপাল বাবু, রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় এবং বৃদ্ধ নায়েব বাবু সকলেই উপস্থিত আছেন।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন—আশ্চর্য এই দস্যু বনহুর।

মিঃ শঙ্কর রাও বলেন—শুধু আশ্চর্য নয় ইন্সপেক্টার অদ্ভুত সে।

গোপাল বাবু হঠাৎ বলে বসে—সত্যি আশ্চর্য বলে আশ্চর্য। কেনই বা সে টাকা নিল, আবার কেনই বা ওভাবে ফিরিয়ে দিয়ে গেল! নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর ভয় পেয়েছে।

শঙ্কর রাও একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বলেন—ভয় পাবার বান্দা সে নয়। সে দেখিয়ে দিল, আমি সব পারি। কিন্তু বাছাধন জানে না শঙ্কর রাও কম নয়, আমি একবার দেখে নেব দস্যু বনহুরকে।

এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করেন চৌধুরী সাহেব। সহাস্যমুখে বলেন—গুড মর্নিং।

সকলেই উঠে দাঁড়িয়ে চৌধুরী সাহেবকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন, তারপর তিনি আসন গ্রহণ করার পর সবাই আসন গ্রহণ করলেন।

ইন্সপেক্টার সাহেব বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলেন—ব্যাপার কি চৌধুরী সাহেব, হঠাৎ যে?

কেন, আসতে নেই নাকি? হেসে বলেন চৌধুরী সাহেব।

ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন বলেন—এখানে কি মানুষ সহজে আসতে চায়?

তার মানে?

মানে যখন একটা কিছু অঘটন ঘটে, তখনই লোকে আমাদের এই পুণ্যভূমিতে পদধূলি দেন।

মিঃ হারুনের কথায় হেসে ওঠেন সবাই।

চৌধুরী সাহেব বলেন—সে কথা মিথ্যা নয় ইন্সপেক্টার সাহেব। তবে আমি অঘটন ঘটিয়ে আসিনি। এসেছি একটা সামান্য কথা নিয়ে।

একসঙ্গে সকলেই চোখ তুলে তাকালেন। মিঃ হারুন জিজ্ঞেস করলেন সামান্য কথা? বলুন, আপনার সামান্য কথাটাই আগে শোনা যাক। কিন্তু তার পূর্বে এদের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দি। ইনি রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় আর ইনি তাঁর নায়েব শঙ্কর বাবু আর ইনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ শঙ্কর রাও। উনি মিঃ রাওয়ের সহকারী গোপাল বাবু। এবার চৌধুরী সাহেবের পরিচয় দেন—আর উনি চৌধুরী মাহমুদ খান হাসানপুরের জমিদার।

চৌধুরী সাহেব আনন্দভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন—আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে অত্যন্ত খুশি হলাম। যদিও আপনাদের নামের সঙ্গে আমার বেশ পরিচয় আছে।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় উঠে দাঁড়িয়ে চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে হাত মিলান—আমিও অত্যন্ত খুশি হলাম, চৌধুরী সাহেব। আপনার সুনাম অনেক শুনেছি, কিন্তু দেখা হয়নি কোনদিন। আজ এখানে আমরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে আনন্দিত হলাম।

চৌধুরী সাহেব বলেন—খবরের কাগজে যে সব ঘটনা পড়লাম এ সব কি সত্য রায়বাহাদুর সাহেব?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সব সত্য। কথাটা অতি গম্ভীর কণ্ঠে বলেন রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়।

মিঃ হারুন হেসে বলেন—না হলে কি আর রায়বাহাদুর মহাশয়ের পুলিশ অফিসে পদধূলি পড়ে।

চৌধুরী সাহেবই বলে ওঠেন—আমি প্রথমেই বুঝতে পেরেছিলাম। আশ্চর্য এই দস্যু বনহুর। টাকাটা ফিরিয়ে দিয়ে সে মহৎ হৃদয়ের পরিচয় দিয়ে গেছে।

এবার মিঃ রাও কথা বলেন—কাকে আপনি মহৎহৃদয় বলছেন চৌধুরী সাহেব। শয়তান বদমাশ। দস্যুতার এটা একটা নতুন চাল।

কিন্তু শুনা গেছে, সে নাকি অনেক দীন দুঃখীকে মুক্তহস্তে দান করছে।

মিথ্যে কথা চৌধুরী সাহেব, সব আজগুবি কথা। কেউ স্বচক্ষে দেখেছে? দস্যু বনহুর কাকে টাকা দিয়েছে? শয়তানটা যে অতি ধূর্ত—এ কথা মিথ্যে নয়।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন—পুলিশকে একেবারে হন্তদন্ত করে মারছে। আমরা তো একেবারে নাজেহাল হয়ে উঠেছি, থাক সে কথা। এবার বলুন চৌধুরী সাহেব, আপনার কি কথা?

হ্যাঁ, এতক্ষণ আসল কথাটাই বলা হয়নি। দেখুন আপনারা সকলেই যখন এখানে উপস্থিত আছেন, তখন ভালোই হলো। আমি আপনাদের দাওয়াত করছি। আমার ভাগনী মনিরা বেগমের জন্ম উৎসব। অনুগ্রহ করে আজ সন্ধ্যায় আমার ওখানে যাবেন। এই নিন কার্ড। কার্ড বের করে নাম লিখলেন। তাঁরপর প্রত্যেককে একখানা করে দিয়ে বলেন—মনে কিছু করবেন না। আপনাদের দাওয়াত করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দবোধ করছি।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় হেসে বলেন—এটা তো খোশখবর। এলাম কোন্ কাজে, পেলাম দাওয়াত। সত্যি আজকের দিনটা আমার বড় শুভ যাচ্ছে।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন—মিথ্যে নয় রায়বাহাদুর সাহেব। শুধু আজকের দিন নয়, কালকের রাত থেকে আপনার শুভরাত্রি শুরু হয়েছে।

চৌধুরী সাহেব এবার মিঃ রাওকে লক্ষ্য করে বলেন—আপনারা নীরব রইলেন যে? গরীবালয়ে আসছেন তো?

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, এতবড় একটা লোভ সামলানো কি সহজ কথা! নিশ্চয়ই আসবো।

ধন্যবাদ! একটু থেমে কি যেন চিন্তা করলেন চৌধুরী সাহেব। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলেন—আমি নিঃসন্তান। ঐ ভাগনীটাই আমার পুত্র এবং কন্যা। অনেক আশা, অনেক বাসনা নিয়েই ওকে আমি মানুষ করেছিলাম.....যাক সে সব কথা, আপনারা মেহেরবানি করে আসবেন কিন্তু।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় বলে ওঠেন—চৌধুরী সাহেব, শুনেছিলাম আপনার নাকি একটি পুত্রসন্তান ছিল?

ছিল,— বিশ বছর আগে তাকে হারিয়েছি। ইন্সপেক্টার, আপনাকে কি বলবো, আট বছরের সে বালকের স্মৃতি আজও আমরা ভুলতে পারিনি। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে চৌধুরী সাহেবের কণ্ঠ—আমার মনির ছিল অপূর্ব, অদ্ভুত ছেলে।

অনুতপ্ত কণ্ঠে বলে ওঠেন মিঃ হারুন—চৌধুরী সাহেব না জেনে কথাটা বলে ভুল করেছি।

না না, আপনি কোন ভুল করেননি ইন্সপেক্টার সাহেব। আপনি না বললেও সদাসর্বদা তার স্মৃতি আমার হৃদয়ে আঘাত করে চলেছে। অনেক কষ্টে ঐ ভাগনীটাকে চোখের সামনে রেখে তাকে ভুলে আছি। আচ্ছা আজকের মত উঠি তাহলে— কথাটা বলে উঠে পড়েন চৌধুরী সাহেব।

সবাই তাঁকে বিদায় সম্ভাষণ জানান।

❑

বাগানে বসে একটা মালা গাঁথছিল নূরী, গুন গুন করে গান গাচ্ছিলো। এমন সময় পেছনে এসে দাঁড়ায় রহমত, নূরীকে জিজ্ঞেস করলো—নূরী সর্দার কোথায়?

ফুলের মালা গাঁথতে গাঁথতেই বলেন নূরী—কি জানি কোথায় সে? আচ্ছা রহমত , শহর থেকে কখন এলে?

এই তো আসছি।

নতুন কোন খবর আছে তাহলে?

খবর না থাকলে কি আর অমনি ছুটে এসেছি।

শহরের বিভিন্ন জায়গায় দস্যু বনহুরের অনুচর ছড়িয়ে থাকতো। নতুন কোন খবর হলেই এসে জানাতো তারা রহমতের কাছে। রহমত খবর নিয়ে ছুটতো বনহুরের নিকট।

নূরী হেসে বলে—কি খবর রহমত, একটু বল না শুনি?

তুমি আবার শুনবে?

হ্যাঁ, বল?

শহরে এক ধনবান লোক আছেন, ভদ্রলোকের নাম চৌধুরী মাহমুদ খান। আজ সন্ধ্যার পর তার কন্যার জন্ম উৎসব হবে।

তাতে কি হলো? এ আবার নতুন খবর কি?

শুনোই না, চৌধুরী সাহেব তার কন্যাকে বহুমূল্যের একটা হীরার আংটি উপহার দেবেন।

তাই বল। নিশ্চয় খুব সুন্দর হবে সে আংটিটা?

আমি কি আর দেখেছি! তবে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর হবে। দেখ নূরী, ঐ আংটিটা যদি তোমার আংগুলে পরো, কি সুন্দর মানাতো!

সত্যি রহমত, আমি হুরকে বলবো, ঐ আংটি আমার চাই। মালা গাঁথা শেষ করে মালাটা ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে কথাটা বলে নূরী।

রহমত বলে—যাই সর্দার কোথায় দেখি।

চলে যায় রহমত। নূরী মালা হাতে উঠে দাঁড়ায়। মালা হাতে ঝরণার দিকে এগিয়ে চলে সে। হঠাৎ ওর নজরে পড়ে ঝরনার পাশে একটা পাথরখণ্ডে বসে আছেন বনহুর।

নূরী পা টিপে টিপে বনহুরের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর চট করে মালাটা ওর গলায় পরিয়ে দিয়ে বসে ছিল পাথরখণ্ডটার একপাশে। হেসে বলেন—খুব চমকে দিয়েছি, না? চমকাবার বান্দা বনহুর নয়। মালাটা হাতে নিয়ে নাড়াচড়া করতে থাকে সে।

নূরী আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে—হুর, একটা খবর আছে।

বল!

রহমত এসেছে।

তারপর?

শহরে কোন এক চৌধুরী-কন্যার নাকি জন্ম উৎসব।

হ্যাঁ, সে উৎসবে আমারও দাওয়াত আছে।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করে নূরী—তার মানে?

মানে আমি যাব সে উৎসবে।

তাহলে তুমিও সে হীরার আংটির কথা জানতে পেরেছো? হুর, ঐ আংটি আমার চাই। বল দেবে আমাকে?

হ্যাঁ নূরী, সে হীরার আংটিটা তোমার ঐ সুন্দর আংগুলে অপূর্ব মানাবে।

হুর, সত্যি তুমি কত ভালবাস আমাকে।

উঠে দাঁড়ায় বনহুর। মালাটা খুলে অন্যমনস্কভাবে নূরীর হাতে দেয়। তারপর চলে যায় সে দরবার কক্ষের দিকে, যেখানে অনুচরবৃন্দ দাঁড়িয়ে আছে তার প্রতীক্ষায়।

❑

চৌধুরী বাড়ি।

আজ মনিরার জন্ম উৎসব। সকাল থেকে বাড়ির সবাই ব্যস্ত। ঘরের যাবতীয় জিনিসপত্র ঘসে-মুছে পরিষ্কার করা হচ্ছে। কয়েকজন পরিচারিকা নিয়ে মরিয়ম বেগম নিজেই এসব করেছেন।

আজ মনিরার মা নেই, রওশন আরা বেগম থাকলে তাঁকে এসব দেখতে হত না, আজ থেকে দু'বছর আগে তিনি কন্যার মায়া ত্যাগ করে জান্নাতবাসিনী হয়েছেন। ননদীনির কথা স্মরণ হতেই মরিয়ম বেগমের মনটা ব্যথায় টন টন করে উঠলো। দু'চোখ ছাপিয়ে গড়িয়ে ছিল দু'ফোটা অশ্রু।

মনিরার মনে আজ আনন্দের উৎস। তার সহপাঠিনীরা আসবে। বান্ধবীদের নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করবে, হাসিগানে ভরে উঠবে আজকের সন্ধ্যাটা। মনিরা গুন গুন করে গান গাইছিল আর ঘুরে বেড়াচ্ছিল, হঠাৎ কক্ষে প্রবেশ করে থমকে দাঁড়ায়।

মরিয়ম বেগম তাকে দেখতে পেয়েই গোপনে চোখের পানি মুছে ফেলেন। তারপর হেসে বলেন—মনিরা, এদিকে শুনো।

মনিরা এসে দাঁড়ায় তার পাশে—আমাকে ডাকছো মামীমা?

হ্যাঁ মা শুনো। বিকেলে কোন্ পাড়ি পরবে ঠিক করে গুছিয়ে রাখোগে, নইলে তখন তাড়াহুড়া করবে।

মামীমা, আমি তোমার একটা শাড়ি পরবো।

সেকি মা, আমার শাড়ি যে সব সেকেলে ধরনের।

হউক না, সে আমার ভালো। আজ আমার জন্ম উৎসব। তোমার শাড়ি হবে আমার আশীর্বাদ।

পাগলী মেয়ে কোথাকার, যদি সখ হয়েই থাকে, তবে এই নাও চাবি, আমার ট্রাঙ্ক খুলে যে শাড়িটা তোমার পছন্দ হয় বের করে নাও।

মনিরা চাবির গোছা হাতে নিয়ে মামীমার কক্ষে চলে যায়। ট্রাঙ্কের ঢাকনা খুলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় সে। ঝকঝক করছে নানা রঙ-বেরঙের শাড়ি। কোনটা জরীর বুটিদার, কোনটা জরী পেড়ে, কোন্‌টা গোটাটাই জরীর তৈরি, বেনারসী, টিস্যু, নানারকমের গাড়িতে ট্রাঙ্ক ভর্তি।

মনিরা এক-একখানা শাড়ি বের করে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। ট্রাঙ্কের সমস্ত শাড়ি বের করে ফেললো মনিরা। হঠাৎ তার দৃষ্টি চলে গেল ট্রাঙ্কের তলায়। সুন্দর একখানা ছবি। মনিরা সব ফেলে ফটোখানা তুলে নিল হাতে। বিস্ময়ভরা নয়নে তাকিয়ে রইলো। পাশাপাশি দু'টি মুখ। একটা বালক আর একটা বালিকা। শুভ্র জ্যোৎস্নার মত নির্মল দুটি মুখ। মনিরা ফটোখানা হাতে নিয়ে ছুটলো মামীমার কক্ষে। মরিয়ম বেগমের সম্মুখে ফটোখানা মেলে ধরে বলে মনিরা—মামীমা, এ কাদের ছবি?

মরিয়ম বেগমের দৃষ্টি ছবি খানার ওপর পড়তেই চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো, অতি কষ্টে নিজকে সংযত রেখে বলেন তিনি— ও ছবি আবার বের করলি কেন মা?

আগে বল এ ছবি কাদের?

ও ছবি তোর আর মনিরের।

মনির। সে আবার কে, মামীমা?

ওরে, সে যে আমাদের সাত রাজার ধন, হৃদয়ের মণি ছিল, আমাদের ছেলে মনির।

হঠাৎ মনে পড়ে মনিরার একটা কথা, অনেকদিন আগে মা একদিন গল্পের ছলে বলেছিল—মনিরা, তোর মামুজান আর মামীমা তোকে যে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিলোরে। বড় আশা ছিল, তোকে একেবারে নিজের করে নেবে, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হলো না।

আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেছিল মনিরা—সে কি মা, আমি কি তাদের নিজেরই নই?

মা বলেছিল—তা নয়, তা নয়। থাক, আর শুনে কাজ নেই, তুমি পড়গে যাও।

মনিরাও কম জেদী মেয়ে নয়! আব্দার ধরে বসলো—তোমাকে বলতেই হবে মা, আমি না শুনে ছাড়ছিনে।

অগত্যা বলেছিল রওশন আরা বেগম—তোর মামুজান আর মামীমার একটা ছেলে ছিল—মনির! তারই জন্য ওরা তোকে আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছিল, আমি কথা দিয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের সকলেরই দুর্ভাগ্য সে রত্ন রইলো না।

মনিরা অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো— মনির। মামীমা, মনির ভাই খুব সুন্দর ছিল বুঝি?

মরিয়ম বেগম বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন—হ্যাঁ, অপূর্ব সুন্দর ছিল আমার মনির, যেমন তুই। তাইতো তোর মায়ের কাছ থেকে তোকে চেয়ে নিয়েছিলাম।

মামীমা, তার কি হয়েছিল?

অসুখে সে মারা যায়নি, আমার মণি নৌকাডুবি হয়ে কোথায় ভেসে গেছে।

—তার লাশ তোমরা পেয়েছিলে?

না, অনেক খোঁজাখুজি করেও তার কোন চিহ্ন আমরা পাইনি।

—গলা ধরে আসে মরিয়ম বেগমের।

মনিরা কিছুক্ষণ স্তব্ধ নয়নে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে—মামীমা, এই ছবি আমার ঘরে টাঙ্গিয়ে রাখবো।

তোর যদি ভালো লাগে রাখ মা, কিন্তু ও ছবি যেন আমার চোখে না পড়ে।

মনিরা ছবিখানাকে বুকে আঁকড়ে ধরে মামীমার কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

নিজের কক্ষে প্রবেশ করে অনেকক্ষণ তাকিয়ে দেখলো মনিরের ছোট্ট ফুটফুটে মুখখানা। মাথায় কোঁকড়ানো চুল, সুন্দর নীল বুদ্ধিদীপ্ত দু'টি চোখ, উন্নত নাসিকা। ছোট বালক হলেও তার সমস্ত মুখে ছড়িয়ে আছে অপূর্ব এক প্রতিভা। তন্ময় হয়ে তাকিয়ে থাকে মনিরা। নিজের শয্যার পাশে টাঙ্গিয়ে রাখলো ছবিখানা।

আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে চৌধুরীবাড়ি। গাড়ি বারান্দায় অগণিত গাড়ি এসে ভীড় জমেছে। মনিরা মামার পাশে দাঁড়িয়ে অতিথিদের অভ্যর্থনা

জানাচ্ছিল। বান্ধবীরা আসছে কেউ বা ফুলের মালা, কেউ বা ফুলের তোড়া নিয়ে মালাগুলো পরিয়ে দিচ্ছে মনিরার গলায়।

অতিথিরা প্রায় সবাই এসে পড়েছেন। পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও, গোপালবাবু, রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয় এবং তাঁর নায়েব বাবু পর্যন্ত উৎসবে উপস্থিত হয়েছেন। এই উৎসবে শ্রেষ্ঠ অতিথি হবেন খান বাহাদুর হামিদুল হক এবং তাঁর পুত্র মুরাদ। কিন্তু এতক্ষণেও তাঁরা এসে পৌছলেন না। ভিতরে ভিতরে কিছুটা চিন্তিত হয়ে ছিল চৌধুরী সাহেব।

খান বাহাদুর হামিদুল হক একজন ধনবান ব্যক্তি, তেমনি সম্মানিত ব্যক্তিও বটে। তাঁর একমাত্র পুত্র মুরাদ বহুদিন লণ্ডনে শিক্ষালাভ করার পর সম্প্রতি দেশে ফিরে এসেছে। চৌধুরী সাহেবের ইচ্ছা মুরাদের সঙ্গে মনিরার বিয়ে দেব। হামিদুল হক সাহেবেরও এ ইচ্ছা। মনিরার অপূর্ব সৌন্দর্য এবং মহৎ ব্যবহার তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। খান বাহাদুর সাহেবের বিপুল ঐশ্বর্য। ভবিষ্যতে নিঃসন্তান চৌধুরী সাহেবের সমস্ত ধনসম্পদ মনিরারই হবে। এই কারণেই খান বাহাদুর সাহেব পুত্র লণ্ডন থেকে ফিরে না আসতেই চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা অনেকটা পাকা করে রেখেছিল।

চৌধুরী সাহেব এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন যদিও মুরাদকে স্বচক্ষে দেখেননি, তবু কথা দিয়েছিল। এহেন অতিথিদের আগমনে বিলম্ব দেখে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে ছিল চৌধুরী সাহেব। তিনি মনিরাকে বলেন—মা, তুমি এখন ওদিকে গিয়ে দেখাশুনা করো। আমি আরও কিছুক্ষণ এখানে অপেক্ষা করি।

মাথা দুলিয়ে বলেন মনিরা—আচ্ছা আমি যাচ্ছি। মনিরা চলে যায়।

চৌধুরী সাহেব গাড়ি বারান্দায় পায়চারী করতে থাকেন।

মনিরা হলঘরে প্রবেশ করে। সম্মানিত অতিথিগণ যে যার আসনে বসে বসে গল্প করছেন। মনিরার কয়েকজন বান্ধবী অর্গানের পাশে বসে গানবাজনা করছে। অনেকেই হাসি গল্পে মেতে উঠেছে। মাঝখানের টেবিলের ওপর স্তূপাকার প্রেজেন্টের জিনিসপত্র। কক্ষে নীল বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। হাসিগল্পে আর অর্গানের শব্দে স্বপ্নময় হয়ে উঠেছে। একটু পরেই টেবিলে খাবার দেয়া হবে।

শহরের এক প্রান্তে খানবাহাদুর হামিদুল হক সাহেবের বাড়ি। লণ্ডন ফেরত পুত্র মুরাদ সাজগোজ করে বেরুতেই রাত প্রায় আটটা বাজিয়ে

দিল। নিজেই ড্রাইভ করে চললো মুরাদ, পেছনের আসনে হামিদুল হক সাহেব বসে রইলেন।

নির্জন পথ বেয়ে গাড়ি ছুটে চলেছে।

ঠিক সে মুহূর্তে পথের ওপাশের ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো দুটো অশ্ব, একটাতে বনহুর স্বয়ং, অন্যটাতে বনহুরের প্রধান অনুচর রহমান। দু'জনের শরীরেই অদ্ভুত কালো ড্রেস, মুখে কালো গালপাট্টা বাঁধা। মোটরের সম্মুখে এসে পথ আগলে দাঁড়ালো তারা।

মুরাদ সামনে বাধা পেয়ে গাড়ি রুখতে বাধ্য হলো।

বনহুর রিভলবার উদ্যত করে বলেন—নেমে এসো।

ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে খানবাহাদুর সাহেবের মুখমণ্ডল। মুরাদের অবস্থাও তাই। হঠাৎ এই বিপদের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না তারা। অগত্যা গাড়ি থেকে নেমে আসতে বাধ্য হলেন খান বাহাদুর সাহেব এবং মুরাদ।

বনহুর রিভলবার ঠিক রেখে রহমানকে ইঙ্গিত করলো।

রহমান দ্রুত মুরাদের শরীর থেকে কোটপ্যান্ট-টাই খুলে নিল।

রাগে, ক্ষোভে অধর দংশন করতে লাগলো মুরাদ। সেও কম নয়, হাতে একটা অস্ত্র থাকলে দেখিয়ে দিত মজাটা কিন্তু কি করবে, নীরব থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। খান বাহাদুর সাহেব ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—তোমরা কে?

দস্যু বনহুর!

এ্যাঁ বল কি! কি চাও বাবা তোমরা? আমাদের নিকট তো কোন অর্থ নেই।

অর্থ চাই না। শুধু আপনারা গাড়িটা কিছুক্ষণের জন্য নেব। বনহুর তাদের বেঁধে ফেলার ইঙ্গিত করলো।

অল্পক্ষণের মধ্যেই রহমান মুরাদ এবং খান বাহাদুর সাহেবকে মজবুত করে বেঁধে ফেললো, তারপর একটা ঝোপের আড়ালে নিয়ে বসিয়ে দিলো।

বনহুর ক্ষিপ্রহস্তে মুরাদের পোশাক পরে নিল, এক জোড়া গোঁফ লাগিয়ে নিল নাকের নিচে। কালো একটা চশমা চোখে পরলো, মাথার ক্যাপটা টেনে ঝুকিয়ে নিল সামনের দিকে বেশি করে। বনহুরের চেহারা একেবারে পাল্টে

গেল। বনহুর এবার রহমানকে লক্ষ্য করে বলেন—আমি যতক্ষণ না ফিরে আসি, ততক্ষণ তুমি এদের পাহারায় থাকবে।

ড্রাইভ আসনে উঠে বসে গাড়িতে স্টার্ট দেয় বনহুর।

বনহুরের অজানা কিছু নেই, সে অশ্বচালনা থেকে সব কিছুই চালনা করতে জানতো। বনহুরের একটা বুইক গাড়ি ছিল, সে গাড়ি বনহুর নিজেই চালাতো। শহরে বনহুরের একটা বাড়ি ছিল। সে বাড়িতেই গাড়িখানা থাকতো। মাঝে মাঝে বনহুর দরকার হলে সে বাড়িতে থাকতো।

বনহুর গাড়ি নিয়ে ছুটে চললো।

বনহুরের গাড়ি পৌঁছতেই চৌধুরী সাহেব চিনতে পারলেন, এ গাড়ি খান বাহাদুর সাহেবের। শশব্যস্তে এগিয়ে এলেন তিনি গাড়ির পাশে কিন্তু একি, খানবাহাদুর সাহেব কই? অপরিচিত এক যুবক বসে আছে ড্রাইভ আসনে। চৌধুরী সাহেব বুঝতে পারলেন এই যুবকই খান বাহাদুর সাহেবের লণ্ডন ফেরত পুত্র মুরাদ। চৌধুরী সাহেব সহাস্যে বলেন—নেমে এসো বাবা।

মুরাদ বেশি বনহুর মাথার ক্যাপটা আরও কিছুটা সামনের দিকে এগিয়ে দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ছিল।

মুরাদবেশী বনহুরের চালচলন দেখে কিছুটা আশ্চর্য হলেন চৌধুরী সাহেব তবু হেসে জিজ্ঞেস করলেন—তোমার আব্বা এলেন না কেন?

বনহুর বলে ওঠে—হঠাৎ তিনি অসুস্থ হয়ে পড়ায় আসতে পারলেন না।

ব্যথিত কণ্ঠে বলেন চৌধুরী সাহেব-বড় আফসোসের কথা। তিনিই যে আজ আমার এই উৎসবে শ্রেষ্ঠ অতিথি।

দুঃখিতভাবে বলেন বনহুর—আব্বার অসুস্থতার জন্যই এত বিলম্ব হলো।

এসো বাবা।

চৌধুরী সাহেব মুরাদবেশী বনহুরকে নিয়ে হলঘরে প্রবেশ করলেন এবং দুঃখের সাথে বলেন-একটা দুঃসংবাদ, আমার বিশিষ্ট বন্ধু খান বাহাদুর সাহেব হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি আসতে পারলেন না। তাঁর পুত্র মুরাদ এসেছে।

কক্ষের সকলেই মুরাদবেশী বনহুরের মুখে তাকালেন। মনিরাও তাকালো, বান্ধবীরা তাকে নিয়ে আলাপ-ঠাট্টা শুরু করলো, কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো মনিরা।

চৌধুরী সাহেব সকলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন। পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন—উনি পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন।

বনহুর হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডশেক করলো।

আর ইনি প্রাইভেট ডিটেকটিভ মিঃ শঙ্কর রাও, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

বনহুর তাঁর সাথে হ্যাণ্ডশেক করে বলেন—আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য লাভ করে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করছি, মিঃ রাও।

আর ইনি রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়।

রায়বাহাদুরের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলেন বনহুর— উনি আমার পরিচিত।

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ বলে উঠেন—এ্যাঁ। এই কণ্ঠ যেন তার কাছে পরিচিত বলে মনে হলো, কিন্তু স্মরণ করতে পারলেন না, এ কণ্ঠ কোথায় তিনি শুনেছিলো।

বনহুর রায় বাহাদুর শ্যামাচরণ মহাশয়কে ভাববার সময় না দিয়ে বলে ওঠে—মানে আপনার সঙ্গে আমি বিশেষভাবে পরিচিত— আব্বার মুখে প্রায়ই আপনার কথা শুনেছি।

রায়বাহাদুর শ্যামাচরণ আশ্বস্ত হন।

চৌধুরী সাহেব সম্মানিত ব্যক্তিদের সঙ্গে মুরাদবেশী বনহুরের পরিচয় করিয়ে দেন। তারপর মনিরার সঙ্গে—এটা আমার ভাগনী মনিরা।

মনিরা! নামটা শুনতেই চমকে উঠলো বনহুর। এ নামটা যেন তার বহু পরিচিত। ভাল করে তাকালো সে মনিরার দিকে। মনিরার অপূর্ব সৌন্দর্য বনহুরকে মুগ্ধ করে ফেললো। মোহগ্রস্তের মত তাকিয়ে রইলো সে।

চৌধুরী সাহেবের কণ্ঠস্বরে সম্বিৎ ফিরে এলো বনহুরের—বসো বাবা, বসো।

বনহুর আসন গ্রহণ করলো, কিন্তু মনের কোণে একটা ধাক্কা খেতে লাগলো—মনিরা কে এ মনিরা— সে মনিরা... যার ছবি এখনও তার গলায় লকেটে রয়েছে। না, না, তা হতে পারে না, কত মেয়ের নামই তো মনিরা হতে পারে!

মনিরাকে বান্ধবীরা ধরে বসলো গান শুনাবার জন্য। অগত্যা মনিরা অর্গানের পাশে গিয়ে বসলো।

গান শেষে করতালিতে ভরে উঠলো উৎসব কক্ষ। চৌধুরী সাহেব হীরার আংটি পরিয়ে দিল মনিরার হাতে।

সকলের অজ্ঞাতে বনহুরের চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই টেবিলে খাবার দেয়া হলো।

খাওয়া-পর্ব শেষ হবার পর বিদায়ের পালা। মুরাদবেশী বনহুর উঠে দাঁড়ালো। চৌধুরী সাহেবের সংগে হ্যাণ্ডশেক করার পর হাত বাড়ালো পুলিশ ইন্সপেক্টার হারুনের দিকে, তারপর মিঃ শঙ্কর রাওয়ের সাথে হ্যাণ্ডশেক করে নিজের গাড়িতে চেপে বসলো।

তারপর সকলেই এক এক করে বিদায় গ্রহণ করলেন। চৌধুরী সাহেব সকলকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে হলঘরে ফিরে এলেন। হঠাৎ নজর গিয়ে ছিল সম্মুখের টেবিলে। একটা নীল রঙের খাম পড়ে রয়েছে। চৌধুরী সাহেব খামখানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে ছিঁড়ে ফেলেন। একখানা নীল রঙের কাগজের টুকরো বেরিয়ে এলো। তিনি আলোর সামনে কাগজখানা মেলে ধরতেই চমকে উঠলেন, সেটাতে লেখা রয়েছে মাত্র ক'টি শব্দ।

"আপনাদের উৎসবে আমি এসেছিলাম।"

—দস্যু বনহুর

মুহূর্তে চৌধুরী সাহেবের মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে উঠলো। মনিরা এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পাশে। ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো—ওটা কি মামুজান?

কাগজখানা মনিরার হাতে দিয়ে বলেন চৌধুরী সাহেব—পড়ে দেখ।

মনিরা কাগজখানা হাতে নিয়ে দৃষ্টি ফেলতেই অস্ফুট শব্দকরে উঠলো—দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ, সে এসেছিল!

দস্যু বনহুর তাহলে সত্যিই এসেছিল, মামুজান?

না, এলে এ চিঠি এলো কোথা থেকে....

চৌধুরী সাহেবের কথা শেষ হতে না হতে গাড়ি-বারান্দা থেকে মোটরের শব্দ ভেসে এলো। ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটলেন চৌধুরী সাহেব। না জানি এত রাতে আবার কে এলো? গাড়ি-বারান্দায় পৌঁছতেই আশ্চর্য হলেন। এ যে খান বাহাদুর সাহেবের গাড়ি। তাড়াতাড়ি পাশে গিয়ে দেখলেন, গাড়ির মধ্যে বসে রয়েছেন খান বাহাদুর হামিদুল হক এবং ড্রাইভার আসনে একটা যুবক।

চৌধুরী সাহেব আনন্দভরা কণ্ঠে বলেন—হক সাহেব আপনি এসেছেন? আসুন, আসুন।

খানবাহাদুর ও তাঁর পুত্র মুরাদ গাড়ি থেকে নেমে ছিল।

চৌধুরী সাহেব ব্যস্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—হঠাৎ আপনার কি অসুখ হয়েছিল?

খানবাহাদুর সাহেব বলেন—চলুন সব বলছি।

চৌধুরী সাহেব ওদের সংগে করে হলঘরে প্রবেশ করলেন। খানবাহাদুর সাহেব ধপাস করে একটা সোফায় বসে পড়েন। মুরাদও বসে পড়ে আর একটা সোফায়।

চৌধুরী সাহেব বলেন—আপনি হঠাৎ নাকি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কি হয়েছিল?

কে বলেন আমি অসুস্থ হয়েছিলাম?

আপনার পুত্র মুরাদের মুখে জানতে পারলাম...

বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন হক সাহেব—আমার পুত্র মুরাদ?

জ্বি হ্যাঁ, কিছু পূর্বে সে চলে গেছে।

আপনি এসব কি বলছেন চৌধুরী সাহেব? আমার পুত্র মুরাদ এই তো আমার পাশে বসা, ও তো এর আগে এ বাড়িতে কোনদিন আসেনি।

একসঙ্গে চৌধুরী সাহেব আর মনিরা চমকে উঠে তাকালো পাশের সোফায় উপবিষ্ট যুবকের মুখের দিকে চেয়ে।

চৌধুরী সাহেব ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করলেন—কিছুক্ষণ পূর্বে আপনার গাড়ি নিয়ে যে যুবক এসেছিল, সে তবে আপনার পুত্র মুরাদ নয়?

না না, সে আমার পুত্র নয়, সে ডাকু..

অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে চৌধুরী সাহেব—ডাকু। সে যুবকই তাহলে দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ, সে যুবকই দুস্য বনহুর—তারপর হক সাহেব সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন।

সব শুনে চৌধুরী সাহেবের কণ্ঠতালু শুকিয়ে এলো। এখন তাহলে উপায়, নিশ্চয়ই দস্যু হানা দেবার পূর্বে অনুসন্ধান নিয়ে গেল। চিন্তিতকণ্ঠে বলেন—এক্ষুণি পুলিশ অফিসে ফোন করে দিই, সমস্ত কথা তাঁদের জানানো উচিত।

চৌধুরী সাহেব আর বিলম্ব না করে তখনই পুলিশ অফিসে ফোন করলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই মিঃ হারুন কয়েকজন পুলিশসহ পুনরায় চৌধুরীবাড়িতে উপস্থিত হলেন।

চৌধুরী বাড়ি এসে সমস্ত ঘটনা শুনে থ' মেরে গেল। এত বড় কথা। যে দস্যু সন্ধানে পুলিশমহলের কারও চোখে ঘুম নেই, অহরহ যার খোঁজে তারা হন্তদন্ত হয়ে শহরময় ছুটাছুটি করে মরছে, সে দস্যু বনহুর তাদের পাশে বসে একসঙ্গে খাবার খেয়ে গেল, এমন কি হাতে হাত মিলিয়ে হ্যাণ্ডশেক পর্যন্ত করে গেল। ছিঃ ছিঃ, এর চেয়ে লজ্জার কথা কি হতে পারে। প্রখ্যাত ডিটেকটিভ শঙ্কর রাওয়ের চোখে পর্যন্ত ধূলি দিয়ে ছেড়েছে সে। এখন আর কি আছে, কয়েকজন পুলিশকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা রেখে ফিরে এলেন।

❑

নিশীথ রাত।

গোটা বিশ্ব সুপ্তির কোলে ঢলে পড়েছে।

বনহুরের অশ্ব চৌধুরীবাড়ির পেছনে এসে থামলো। তার শরীরে কালো ড্রেস, মাথায় পাগড়ী, মুখে কালো রুমাল বাঁধা।

আজ ক'দিন থেকে চৌধুরীবাড়ির কারও চোখে ঘুম নেই। চৌধুরী সাহেব স্বয়ং গুলিভরা রিভলবার হাতে হলঘরে পায়চারী করে করে রাত কাটান। মরিয়ম বেগমের চোখেও ঘুম নেই। গোটা রাত তাঁর অনিদ্রায় কাটে। শুধু বিছানায় শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করেন। হীরার আংটির জন্য তাঁর কোন চিন্তা নেই, চিন্তা যত মনিরাকে নিয়ে দস্যু বনহুর হঠাৎ কিছু না অমঙ্গল ঘটিয়ে বসে।

মনিরা নিজের কক্ষে শুয়ে আতঙ্কে শিউরে ওঠে। ঘুমাতে গিয়ে চমকে ওঠে সে। না জানি কোন মুহূর্তে তার হীরার আংটি লুটে নেবে হয়ত তাকে জীবনে মেরে ফেলতেও পারে। দস্যুর অসাধ্য কিছু নেই। ভয়ভীতি নিয়ে প্রহর গুণে মনিরা, তারপর এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

মনিরা হীরার আংটি আংগুলে রাখার সাহস পায়নি। আলমারীতে রেখে তালাবন্ধ করে দিয়েছে। দস্যু হানা দিলে হীরার আংটি নিয়ে যাবে, তবু তার শরীরে যেন আঘাত না পায়।

আজ ক'দিন হলো মনিরা ঘুমায়নি, তাই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েছে আজ মনিরা।

হলঘর থেকে চৌধুরী সাহেবের জুতোর শব্দ ভেসে আসছে। পাশের ঘর থেকে ভেসে আসছে মরিয়ম বেগমের চুড়ির টুনটান শব্দ। সদর গেটে সশস্ত্র পুলিশ দণ্ডায়মান।

জানালার শার্শী খুলে কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর। ধীরে ধীরে অতি লঘু পদক্ষেপে মনিরার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। প্যান্টের পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে মনিরার নাকের সামনে ধরলো তারপর মনিরার বালিশের তলা থেকে চাবির গোছা বের করে নিয়ে এগিয়ে চলে আলমারীর দিকে। অল্পক্ষণেই আলমারী খুলে বের করে আনে সে বহু মূল্যবান হীরার আংটি।

কক্ষে একটা নীলাভ ডিমলাইট জ্বলছিল, সে আলোতে বনহুরের হাতে হীরার আংটিটা ঝক্‌ঝক্ করে উঠে। আংটিটা প্যান্টের পকেটে রেখে এগিয়ে যায় সে মনিরার বিছানার পাশে। ছিন্নলতার ন্যায় মনিরার সুকোমল দেহখানা বিছানায় লুটিয়ে আছে। এলোমেলো চুলগুলো ছড়িয়ে আছে ললাটের চারপাশে। অপূর্ব দেখাচ্ছিল মনিরাকে। বনহুর নির্নিমেষ নয়নে কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে রইলো, তারপর চলে যাবার জন্য যেমনি সে ফিরে দাঁড়াতে যায়, অমনি নজর গিয়ে পড়ে তার দেয়ালের ওপর। বিস্ময়ে চমকে ওঠে বনহুর। একি! এ তারই লকেটের ছবি। পাশাপাশি দুটি মুখ, সে আর মনিরা। আশ্চর্য! এ ছবি এখানে এলো কি করে? বনহুর নিজের গলার মালাছড়া জামার নিচে হতে টেনে বের করলো, তারপর লকেটের ঢাকনা খুলে ফেললো। একবার তাকালো সে দেয়ালের ছবিখানার দিকে তারপর পকেটে। এ যে একই ছবি! না, কোন ভুল নেই। তবে কি এই তার সে মনিরা, যে মনিরা শিশুকালে তার হৃদয় জয় করে নিয়েছিল? বনহুর ঝুঁকে ছিল মনিরার মুখের ওপর। এইতো সে তিলটা এখনও রয়েছে তার চিবুকের একপাশে। লকেটের ছবিখানার দিকে লক্ষ্য করে আশ্বস্ত হলো সে, এই তার সে মনিরা। আনন্দে বনহুরের চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। ফিরে পেয়েছে সে, তার মনিরাকে তাহলে ফিরে পেয়েছে। বনহুর বসে ছিল মনিরার পাশে, সযত্নে মনিরার ললাট থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিয়ে ভাল করে দেখতে লাগলো। কতদিন, কত যুগ পরে সে যেন ফিরে পেল তার মনিরাকে। বনহুরের ঠোঁট দু'খানা মনিরার ললাট স্পর্শ করলো।

এবার বনহুর মনিরার সুকোমল হাতখানা তুলে নিল হাতে, তারপর প্যান্টের পকেট থেকে বের করে আনলো হীরার আংটিটা, অতি যত্নে পরিয়ে দিল সে মনিরার আঙ্গুলে।

একটুকরা কাগজ বের করে তাতে লিখল—

"আমি এসেছিলাম" — দস্যু বনহুর।

কাগজখানা মনিরার বিছানার পাশে রেখে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে।

❑

বনহুরের অশ্ব গিয়ে থামতেই ছুটে এলো নূরী। বনহুরকে হাত ধরে নামিয়ে নিল সে! তারপর হেসে বলেন— এনেছো আমার হীরার আংটি?

চলতে চলতে বলে বনহুর— আনতে পারলাম না, একজন কেড়ে নিল।

মিথ্যা কথা। দস্যু বনহুরের কাছ হতে কেউ যে কিছু কেড়ে নিতে পারবে— এ আমি বিশ্বাস করতে পারিনে।

কেন? আমার চেয়ে কেউ কি বীরপুরুষ নেই?

না, আমার কাছে সব পুরুষের চেয়ে তুমিই শক্তিমান।

নূরীর কথায় হাসলো বনহুর। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলেন- তোমার এ বিশ্বাস অটুট রইলো কই! হীরার আংটি হাতে পেয়েও তোমার নিকট পৌছাতে পারলাম না।

নূরী বনহুরের দক্ষিণ হাত চেপে ধরলো সত্যি তুমি হীরার আংটি হাতে পেয়েও---

হ্যাঁ নূরী, আমি পরাজিত হয়েছি।

না না, এ আমি বিশ্বাস করি না হুর, এ আমি বিশ্বাস করি না---

নূরী, সামান্য একটা হীরার আংটি তোমাকে এতখানি মোহগ্রস্ত করে ফেলেছে?

না হুর, শত শত হীরার আংটি আমার কাছে তুচ্ছ। আমি কিছুতেই ভাবতে পারিনে দস্যু বনহুরকে কেউ পরাজিত করতে পারে। তুমি সত্যি করে বল, কারও কাছে তুমি হেরে যাওনি?

নূরী, তোমার বিশ্বাস যেন অটুট থাকে। ইনশাআল্লাহ বনহুর কারও কাছে শক্তির দিক দিয়ে পরাজিত হবে না।

নূরী আনন্দে অস্ফুটধ্বনি করে ওঠে—হুর!

নিজের কক্ষে প্রবেশ করলো বনহুর। নূরী তার শরীর থেকে দস্যুর ড্রেস খুলে নেয়, তারপর উভয়ে বসে পড়ে পাশাপাশি। নূরী বনহুরের চুলে

আংগুল বুলিয়ে দিতে দিতে বলে—হুর, তুমি সত্যি বীরপুরুষ। তোমার শক্তির কাছে সমস্ত লোক পরাজিত, তোমার বুদ্ধির কাছে সবাই হেয়! হাজার হাজার লোকের চোখে ধূলো দিয়ে তুমি তোমার সাধনা পূর্ণ করে চলেছো। শত শত পুলিশবাহিনী তোমাকে পাকড়াও করার জন্য অহরহ ক্ষিপ্তের ন্যায় ছুটাছুটি করছে। কেউ তোমাকে আজও পাকড়াও করতে সক্ষম হলো না। তোমার এই ভূতপূর্ব বীরত্বকে আমি শ্রদ্ধা করি। খোদা তোমাকে চিরদিন এমনি করে জয়ী করুন।

নূরী, তুমিই শুধু আমার হিতাকাঙ্ক্ষী। আর কেউ আমার মঙ্গল কামনা করে না। সবাই চায় দস্যু বনহুরের পতন!

ছিঃ! ও কথা মুখে এনো না হুর; আমার প্রাণে বড় ব্যথা লাগে, তোমার অমঙ্গল আমার কাছে মৃত্যুর চেয়েও কষ্টদায়ক।

বনহুর অবাক নয়নে তাকালো নূরীর অশ্রুসিক্ত চোখ দু'টির দিকে। নূরী তাকে এত ভালবাসে কিন্তু ধীরে ধীরে নূরীর মুখ খানা মিলিয়ে গিয়ে সেখানে ভেসে ওঠে একটা সুন্দর ফুলের মত কোমল ঘুমন্ত মুখ। বনহুর দৃষ্টি নত করে কি যেন ভাবতে লাগলো।

নূরী বলেন—হুর, আজ তোমাকে যেন কেমন ভাবাপন্ন লাগছে। কি হয়েছে তোমার?

বললাম তো কিছু না। তুমি যাও নূরী, আমি এখন বিশ্রাম করবো।

কেন, আমি থাকলে তোমার কি খুব অসুবিধা হচ্ছে? আমি যাই। অভিমান ভরে উঠে দাঁড়ায় নূরী।

অন্যদিন হলে বনহুর ওর হাত চেপে ধরে পুনরায় বসিয়ে দিত কিংবা নিজেও উঠে দাঁড়িয়ে বলত—চলো আমিও যাই তোমার সঙ্গে, কিন্তু আজ বনহুর নীরব থেকে যায়।

নূরীর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যায় সে।

বনহুর বিছানায় গিয়ে গা এলিয়ে দেয়, তারপর ধীরে ধীরে বুজে আসে ওর চোখের পাতা।

আড়ালে দাঁড়িয়ে নূরী তাকিয়ে থাকে বনহুরের মুখে। বনহুরকে নিয়ে সে রচনা করে চলেছে এক স্বপ্নসৌধ। নূরীর মন চলে যায় দূরে, অনেক দূরে—সেখানে শুধু সে আর বনহুর। কিন্তু বনহুরকে সে যতই আঁকড়ে ধরতে চায়, ততই যেন সে সরে পড়ে দূরে। কিছুতেই নূরী বনহুরের নাগাল পায় না। বিগত দিনের স্মৃতি হাতড়ে চলে নূরী। কিন্তু সেখানেও ফাঁকা লাগে,

বনহুরের নাগাল সে কোনদিন পায়নি। কোথায় যেন ব্যবধান আছে দু'জনের মধ্যে।

আর ভাবতে পারে না নূরী, সমস্ত ভাবনা যেন তার খাঁই হারিয়ে ফেলে। ধীরে ধীরে চলে যায় সে নিজের ঘরে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবে নূরী কত কথা, সে ছোট্ট হতে এত বড় পর্যন্ত। সব সময় সে বনহুরকে দেখে আসছে। এক সঙ্গে খেলা করেছে, এক সঙ্গে খেয়েছে, ঝর্ণায় সাঁতার কেটেছে, কিন্তু কৈ, বনহুরকে সে তো কোনদিন নিজের করে পায়নি। ব্যথায় গুমড়ে কেঁদে ওঠে নূরীর মন। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে সে। বিশেষ করে আজকের কথাটা তার হৃদয়ে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছে নূরী, হঠাৎ একটা শব্দে ঘুম ভেংগে যায় তার, দেখতে পায় তার কক্ষের জানালার শিক বাঁকিয়ে কক্ষে প্রবেশ করতে যাচ্ছে একটা হিংস্র বাঘ। অন্ধকারে বাঘের চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। মাত্র আর একটা শিক বাঁকাতে পারলেই বাঘটা তার কক্ষে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে।

নূরী ভয়ার্ত কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলো।

পাশের কক্ষে ঘুম ভেংগে গেল বনহুরের। নূরীর কক্ষ লক্ষ্য করে ছুটে চললো সে। কিন্তু পূর্বেই বাঘটা জানালার শিক ভেংগে কক্ষে প্রবেশ করলো।

বনহুর কক্ষে প্রবেশ করতেই বাঘটা লাফিয়ে ছিল তার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে বনহুর পড়ে গেল মাটিতে। নূরী আর্তনাদ করে দু'হাতে চোখ ঢাকলো। কিন্তু পরক্ষণেই নিজকে সামলে নিয়ে নিজের কোমর থেকে ছোরা খুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিল বনহুরের দিকে। বনহুর ছোরাখানা লুফে নিয়ে বসিয়ে দিল বাঘটার বুকে। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চললো বাঘ আর বনহুরের মধ্যে।

ততক্ষণে কক্ষে আরও বহু দস্যু এসে জড়ো হয়েছে। বাঘটা তখন ঢলে পড়লো মেঝেতে। বনহুর গায়ের ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু তার শরীরে কয়েকটা স্থান ক্ষতবিক্ষত হয়ে রক্ত ঝরছে দরদর করে।

নূরী এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলো না, ছুটে এসে দু'হাতে নিজের ওড়নার কাপড় ছিঁড়ে বেঁধে দিতে লাগলো ওর ক্ষত স্থানগুলো। অন্যান্য দস্যু বনহুরের এই বীরত্বে আশ্চর্য হয়ে যায়! তারা ভাবতেও পারেনি তাদের সর্দার এত বড় একটা বাঘকে একাই সাবাড় করতে পারবে। সবাই বনহুরের জয়ধ্বনি করে ওঠে।

❑

ভোরে ঘুম ভাঙতেই চোখ মেলে তাকালো মনিরা। মুক্ত জানালা দিয়ে ভোরের মিষ্টি হাওয়া তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। হাই তুলে উঠে বসলো সে। হঠাৎ তার নজর ছিল হাতের আংগুলে। একি! হীরার আংটি তার আংগুলে এলো কি করে? সে যে আলমারীতে উঠিয়ে রেখেছিল আংটিটা! তাড়াতাড়ি বালিশের তলায় হাত দিয়ে চাবি গোছা নিতে যায়, কিন্তু কোথায় চাবির গোছা! আলমারীর কপাটে চাবির গোছা ঝুলছে!

মনিরার বেশ স্মরণ আছে, শোবার পূর্বেও সে বালিশের তলায় চাবির গোছা হাত দিয়ে অনুভব করে নিয়ে তবেই শুয়েছে। তবে কি ঘরে কেউ এসেছিল? দরজার দিকে তাকালো সে। দরজা যেমন খিল দিয়ে আটকানো ছিল, ঠিক তেমনি আছে। ঘরে তাহলে কেউ আসেনি। মনিরা ধড়মড় করে শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো, অমনি তার নজর গিয়ে পড়ে বিছানার পাশে একটা কাগজের টুকরা পড়ে আছে। কাগজখানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে এলো—দস্যু বনহুর এসেছিল!

ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখে পুনরায় তাকালো সে নিজের আংগুলে। দস্যু বনহুর তাহলে হীরার আংটি গ্রহণ না করে তার আংগুলে পরিয়ে দিয়ে গেছে। এর উদ্দেশ্য কি? অপমান, ঘৃণায় রি রি করে উঠলো মনিরার শরীর। কেন সে হীরার আংটি নিয়ে গেল না, কেন সে তাকে স্পর্শ করলো? এতই ঘুমিয়ে পড়েছিল সে? ছিঃ ছিঃ ছিঃ, কি করে সে এক কথা মামুজান আর মামীমার কাছে বলবে। একটা দস্যু তার আংগুলে আংটি পরিয়ে দিয়ে যাবে—!

মনিরা দরজা খুলে মামীমার কক্ষে প্রবেশ করলো।

মরিয়ম বেগম কন্যা-সমতুল্যা ভাগ্নীকে হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করতে দেখে বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন—কি হয়েছে মনিরা?

মনিরা ব্যস্তসমস্ত কণ্ঠে বলেন—এই দেখ মামীমা, আমার হীরার আংটি আলমারীতে রেখেছিলাম, কিন্তু রাতে আমার হাতের আংগুলে এসে পড়েছে।

কি আশ্চর্য কথা, এসব কি বলছিস তুই?

সত্যি মামীমা আলমারীতে হীরার আংটি বন্ধ করে রেখে ঘুমিয়েছিলাম, কিন্তু ভোরে দেখি হীরার আংটি আঙ্গুলে, আর চাবির গোছাও বালিশের তলায় নেই, আলমারীর গায়ে ঝুলছে।

সর্বনাশ, এ যে অদ্ভুত কথা!

এই দেখ—বনহুরের লেখা কাগজখানা মরিয়ম বেগমের হাতে দেয় মনিরা—এটা পড়ে দেখ।

কাগজখানা হাতে নিয়ে দৃষ্টি বুলাতেই অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠলেন মরিয়ম বেগম—একি, দস্যু বনহুর এসেছিল।

ততক্ষণে মরিয়ম বেগমের আর্তচিৎকার শুনে ছুটে আসেন চৌধুরী সাহেব—কি হলো, কি হলো?

ওগো, দস্যু হানা দিয়েছিল

দস্যু!

হ্যাঁ, দস্যু বনহুর মনিরার কক্ষে হানা দিয়েছিল।

হীরার আংটি নিয়ে গেছে?

না গো, না।

তাহলে সে হীরার আংটি নিতে পারেনি?

নিয়েও নেয়নি।

তার মানে?

এবার বলে মনিরা—মামুজান, রাতে শোবার পূর্বে আংটি খুলে আলমারীতে বন্ধ করে চাবির গোছাটা বালিশের তলায় রেখেছিলাম। ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেখি, আংটিটা আমার হাতের আংগুলে এসে গেছে, চাবির গোছা যেখানে রেখেছিলাম সেখানে নেই, আলমারীর গায়ে ঝুলছে। বিছানায় পড়ে আছে এই কাগজের টুকরাটা, পড়ে দেখ মামুজান।

কাগজের টুকরাখানায় নজর বুলিয়ে গম্ভীর হয়ে পড়েন চৌধুরী সাহেব। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে কি যেন ভাবলেন। তারপর বলেন— এত সতর্কতার মধ্যেও সে আসতে পারলো! হলঘরে আমি, বাড়ির ভিতরে বন্দুকধারী পাহারাদার, সদর গেটে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী। এর মধ্যেও দস্যু বনহুর হানা দিতে পারলো? হীরার আংটি নেয়নি সে, কিন্তু এমন কিছু নিয়ে গেছে, যা হীরার আংটির চেয়েও মূল্যবান। দেখ দেখি, আমার ঘরের সিন্দুকটা।

সকলে ছুটলো চৌধুরী সাহেবের শোবার ঘরে। সে ঘরের জিনিসপত্র যেটা যেখানে সে রকমই আছে, সিন্দুকের পাশেও কেউ যায়নি। আশ্বস্ত হলেন চৌধুরী সাহেব।

মরিয়ম বেগম বলেন—দস্যু বনহুর হানা দিয়ে কিছু না নিয়েই চলে গেল, সত্যি বড় আশ্চর্যের কথা।

হ্যাঁ, অদ্ভুত ব্যাপার, যাক পুলিশ অফিসে ফোন করছি— বলেন চৌধুরী সাহেব।

মনিরা বলে ওঠে—কি দরকার মামুজান, সে যখন কোন অন্যায় করেনি, তখন অযথা এ নিয়ে কথা বাড়িয়ে আর লাভ কি?

মরিয়ম বেগম বলে ওঠেন—না মনিরা, তা হয় না। বাড়িতে আরও কড়া পাহারার ব্যবস্থা করতে হবে। শয়তানটা সুযোগ বুঝে আবার সর্বনাশ করে বসবে। হায় একি হলো, দস্যু বনহুরের নজর শেষ পর্যন্ত আমাদের ওপর এসে পড়ল। ওগো; তুমি পুলিশকে সব জানিয়ে আরও পাহারার ব্যবস্থা করো। আমি যে আর ভাবতে পারছি না। মরিয়ম বেগম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

❑

স্বামীকে খেতে দিয়ে বলেন মরিয়ম বেগম—ওগো, সেদিন মনিরার জন্ম-উৎসবে খানবাহাদুর সাহেব আর তাঁর ছেলে মুরাদ ঠিকভাবে যোগ দিতে পারেননি, হঠাৎ এ দস্যুটা কি কাণ্ডই না করেছিল, আর একদিন ওদের দাওয়াত করে এসো না?

খেতে খেতে বলেন চৌধুরী সাহেব—ঠিক বলছো। সে কথা আমার মনেই ছিল না। আজই আমি ফোন করে দেব, কাল বিকেলে তাঁরা যেন আসেন।

হ্যাঁ, তাই কর। কিন্তু কেবল ফোন করলে হবে না, তুমি নিজে গিয়ে দাওয়াত করে এসো। যা হউক দু'দিন পর মনিরাকে যখন মুরাদের হাতে স'পে দিতে হবে, তখন আগে থেকে ওদের মধ্যে একটা আলাপ-পরিচয় হওয়া ভাল।

তাহলে আমিই যাব?

আড়ালে দাঁড়িয়ে মনিরা মামুজান আর মামীমার কথা শুনে। কি জানি কেন যেন ভালো লাগে না মনিরার। সেদিন সে মুরাদকে ভালোভাবে লক্ষ্য করেছে, কিন্তু কৈ তার মনের কোণে ওর ছবি তো রেখাপাত করেনি? কোন আকর্ষণ অনুভব করেনি মনিরা হৃদয়ে। ধীরে ধীরে মনিরা চলে যায় নিজের কক্ষে। বিছানায় গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে, তাকায় সে ছবিখানার দিকে। নিষ্পলক নয়নে তাকিয়ে থাকে মনিরা। কি সুন্দর দুটি চোখ, অপূর্ব অদ্ভুত! মনিরার চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে, সত্যই কি মনির নদীর স্রোতে ভেসে গেছে, মারা গেছে সে? না না, সে হয়তো বেঁচে আছে, মস্ত বড় যুবক

হয়েছে সে, আরও সুন্দর হয়েছে হয়তো কিন্তু কি করে তা হতে পারে। গভীর পানিতে ক্ষুদ্র একটা বালক কি করে বাঁচতে পারে? মনিরার মন যেন ডেকে বলে সে বেঁচে আছে, নইলে তার লাশ পাওয়া যেত। গভীর চিন্তার অতলে তলিয়ে যায় মনিরা।

❑

খানবাহাদুর সাহেব আর মুরাদকে দাওয়াত করে এসেছেন চৌধুরী সাহেব। আজ বিকেলে আসবেন তাঁরা। মরিয়ম বেগম স্বহস্তে পাকশাক করছেন। চৌধুরী সাহেবের ব্যস্ততার সীমা নেই।

মরিয়ম বেগমের পাক শেষ হতে বেলা গড়িয়ে এলো। তিনি ছুটলেন মনিরার কক্ষে। তার চুল বাঁধা, কাপড় পরা শেষ হলো কিনা দেখতে, কিন্তু মনিরার কক্ষে প্রবেশ করে অবাক হলেন তিনি। মনিরা বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছে। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে আছে বালিশের উপরে! একখানা অপরিপাটি কাপড় পরনে। মরিয়ম বেগম রাগতকণ্ঠে বলেন—মনিরা, একি, এখনও তুমি শুয়ে আছ? ওঁদের যে আসার সময় হলো? বই থেকে মুখ না তুলেই বলে মনিরা—কাদের আসার সময় হলো মামীমা?

সে কি, খানবাহাদুর সাহেব আর তাঁর ছেলে মুরাদ আসবে যে!

তাতে আমার কি?

আশ্চর্য করলি মনি, তাতে তোর কি, তা জানিসনে?

না তো? বই রেখে উঠে বসে মনিরা।

মুরাদের মত এত উচ্চশিক্ষিত ছেলেকে কেন আমরা এত সমাদর করছি, এ কথা খুলে বলতে হবে তোকে?

বুঝেছি, আমি তোমাদের গলগ্রহ হয়েছি।

ছিঃ ছিঃ! ওসব কি বলছিস মনি!

হ্যাঁ মামীমা, আমি তোমাদের চোখের বালি হয়ে পড়েছি। নইলে তোমরা আমাকে তাড়ানোর জন্য এত উঠে পড়ে লেগেছো কেন?

মরিয়ম বেগম মনিরার পাশে এসে বসে মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বলেন—আমরা তোমাকে তাড়ানোর জন্য উঠে-পড়ে লেগেছি, এসব কি বলছো মনিরা? লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি ছাড়া আর কে আছে এই বুড়ো-বুড়ীর?

তবে যে সব সময় বিয়ে আর বিয়ে করে ব্যস্ত হচ্ছো?

পাগলী মেয়ে! এখন বড় হয়েছো, বিয়ে করতে হবে না?

না, আমি বিয়ে করবো না।

তা হয় না মনি, মেয়েছেলে কোনদিন বাপ-মার ঘর আগলে থাকতে পারে না। কথাটা একটু কঠিন কণ্ঠেই বলেন মরিয়ম বেগম।

মনিরাও অভিমানভরা গলায় বলে—মামীমা, তোমাদের ঘর আগলে থাকতে চাইনে। আমি বিয়েও করতে চাইনে।

মনিরা তুমি ক্ষচি খুকি নও। বয়সও তোমার কম হয়নি। সব বুঝতে শিখেছ, মুরাদের মত একটা সর্বগুণে গুণবান ছেলেকে হেলায় হারাতে পারি না। তুমি কাপড়-চোপড় পরে নিচে নেমে এসো।

এমন সময় চৌধুরী সাহেব কক্ষে প্রবেশ করেন—একি মা মনি এখনও তোমার হয়নি। লক্ষ্মী মা আমার, চট করে জামাকাপড় পরে নাও।

মরিয়ম বেগম বেরিয়ে গেল। চৌধুরী সাহেব কন্যা-সমতুল্য ভাগনীকে আদর করে আরও বলেন—তারপর নেমে গেল নিচে।

মামুজান আর মামীমা বেরিয়ে যেতেই পুনরায় বইখানা মেলে ধরে মনিরা চোখের সামনে। কিন্তু মন আর বসে না, কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করে। বই রেখে উঠে পড়ে, কিছুক্ষণ মুক্ত জানালায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকে নীল আকাশের দিকে। শুভ্র বলাকার মত ডানা মেলে সাদা সাদা মেঘগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে, সে দিকে তাকিয়ে কত কথা ভাবে সে।

হঠাৎ নিচে গাড়ি-বারান্দা থেকে ভেসে আসে মোটরগাড়ির শব্দ! মনিরা বুঝতে পারে, খান বাহাদুর এবং তার পুত্র মুরাদ পৌঁছে গেছেন। নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও মনিরা ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করে। ড্রেসিংরুম থেকে যখন মনিরা বাইরে বেরিয়ে এলো তখন তাকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। নিচে নেমে আসতেই শুনতে পেল চৌধুরী সাহেব বলছেন—ঠিক কথাই বলছেন খান বাহাদুর সাহেব, শুভ কাজ যতো শীঘ্র হয় ততোই ভালো। মনিরাকে যখন আপনার এত পছন্দ তখন—কথা শেষ হয় না চৌধুরী সাহেবের, মনিরাকে দেখতে পেয়েই সহাস্যে বলেন—এই যে মা মনি এসে গেছে। এত বিলম্ব করলে কেন মা?

খান বাহাদুর সাহেবও চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে যোগ দিয়ে বলেন—কখন থেকে আমরা তোমার প্রতীক্ষা করছি মা বসে বসে।

মুরাদ সেদিন এভাবে মনিরাকে দেখার সৌভাগ্য লাভ করেনি, আজ মনিরাকে দেখে মুগ্ধ হলো সে। উঠে দাঁড়িয়ে সাহেবী কায়দায় মনিরাকে সম্ভাষণ জানালো।

মনিরা কোন উত্তর না দিয়ে একটা সোফায় বসে ছিল।

এ কথা সে কথার মধ্য দিয়ে খাওয়া দাওয়া শেষ হলো।

মুরাদ এক সময় বলে বসলো—চলুন না মিস মনিরা, একটু বেড়িয়ে আসি।

চৌধুরী সাহেব বলে ওঠেন—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, যাও মা একটু বেড়িয়ে এসো!

মনিরা মৃদুকণ্ঠে বলেন—মামুজান, আজ আমার শরীর ভালো নেই।

খান বাহাদুর সাহেব হেসে বলেন—বাইরের হাওয়াতে শরীর সুস্থ বোধ হবে, যাও মা যাও।

মরিয়ম বেগমও তাদের সঙ্গে যোগ দিল—মুরাদ যখন বলছে, তখন যাও মনিরা!

মনিরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে দাঁড়ালো।

মুরাদ খুশি হলো। আনন্দসূচক শব্দ করে বলেন—থ্যাঙ্ক ইউ, চলুন মিস মনিরা।

ড্রাইভ আসনের দরজা খুলে ধরে বলে মুরাদ—উঠুন।

মনিরা তার কথায় কান না দিয়ে পেছনের আসনে উঠে বসলো।

মুরাদ মনে মনে একটু ক্ষুণ্ন হলেও মুখোভাবে তা প্রকাশ না করে ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দিল।

গাড়ি ছুটে চলেছে।

মুরাদ সিগারেট থেকে একরাশ ধোয়া পেছন সিটের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলেন—এখন কি সুস্থ বোধ করছেন?

মনিরা সে কথার জবাব না দিয়ে বলেন—চলুন কোথায় যাব।

মৃদু হাসলো মুরাদ—কোথায় যেতে ইচ্ছে বলুন তো? ক্লাবে, না লেকের ধারে।

ক্লাবে আমি যাই না।

কেন? বাঙ্গালী মেয়েদের যত গোঁড়ামি। বিশ্রী ব্যাপার! বিলেতে কিন্তু এসব নেই। চলুন লেকের ধারেই যাওয়া যাক।

লেকের ধারে এসে মুরাদের গাড়ি থেমে ছিল। নেমে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে ধরে বলেন— আসুন।

মনিরা নেমে চলতে শুরু করলো।

লেকের ধারে গিয়ে বসে ছিল মনিরা। মুরাদও বসলো তার পাশে, ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো সে।

মনিরা বিরক্তি বোধ করলো, সরে বসলো সে।

মুরাদ হেসে বলেন—মিস মনিরা, আমি বুঝতে পারিনে এ দেশের মেয়েরা এত লজ্জাশীলা কেন—আমি বিলেতে সাত বছর কাটিয়ে এলাম কিন্তু কোন মেয়ের মধ্যে এমন জড়তা দেখলাম না, ওরা যে কোন পুরুষের সঙ্গে প্রাণখোলা ব্যবহার করতে পারে।

মনিরা গম্ভীর কণ্ঠে বলে ওঠে—মিঃ মুরাদ, আমি সেজন্য দুঃখিত। মেয়েদের অত স্বাধীনতা আমি পছন্দ করিনে।

ছিঃ ! ছিঃ আপনি দেখছি একদম সেকেলে ধরনের! মেয়েরাই তো আজকাল দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে আনছে। তারা এখন পুরুষের সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে শিখেছে, তাইতো দেশ ও জাতির এত...

মুরাদের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে মনিরা—তাইতে দেশ ও জাতির এত অবনতি।

অবনতি! এ আপনি কি বলছেন মিস মনিরা?

হ্যাঁ মিঃ মুরাদ, বিশেষ করে আমার চোখে।

তার মানে?

মানে মেয়েরা আজকাল বিলেতী চাল ধরেছে! বিলেতী চাল চালতে গিয়ে এত অধঃপতনে নেমে গেছে তারা, যা বলার নয়। এমন সব উৎকৃষ্ট পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে শুরু করেছে তারা, যা মুসলিম সমাজের কাছে অত্যন্ত হেয়। টেডী পোশাক পরতে গিয়ে মেয়েরা প্রায় উলঙ্গ হয়েই চলাফেরা করছে। আর দু'দিন পর তারা যে আরও কত নিচে নেমে যাবে, ভাবতেও মনে ঘৃণা জন্মে।

মুরাদ আশ্চর্য হয়ে শুনছিল মনিরার কথাবার্তা। হেসে বলেন—মিস মনিরা, আপনি দেখছি বড্ড নীরস ধরনের মেয়ে। টেডী পোশাক মানুষকে কত মানায়, বিশেষ করে মেয়েদের। মিস মনিরা, আপনি এসব অনুভব করতে পারেন না।

আমি অনুভব করতে চাইনে। চলুন, এবার ওঠা যাক।

সেকি! এরি মধ্যে উঠতে চাচ্ছেন? মিস মনিরা, সত্যি আপনার অপরূপ সৌন্দর্য আমাকে মুগ্ধ করেছে! যদিও আপনার মন সেকেলে ধরনের কিন্তু আপনার চেহারা একেলে মেয়েদের চেয়ে অনেক সুন্দর। বিলেতী মেয়েরা কোন ছার!

দেখুন আমার সৌন্দর্যের প্রশংসার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। কিন্তু পুনরায় আমি একথা শুনতে চাইনে।

মিস মনিরা, অদ্ভুত মেয়ে আপনি। আমি জীবনে বহু মেয়ের সঙ্গে মিশার সুযোগ লাভ করেছি, আপনার মত আশ্চর্য মেয়ে আমি কোনদিন দেখিনি। সে সব মেয়েরা পুরুষের মুখে নিজেদের প্রশংসা শুনার জন্য সর্বদা উন্মুখ হয়ে থাকে।

প্লীজ মিঃ মুরাদ শুনতে চাইনে। উঠে দাঁড়ায় মনিরা।

মুরাদ চট করে ওর হাত চেপে ধরে—আমি উঠতে দিলে তো উঠবেন! বসুন আমার পাশে।

মনিরা বিরক্ত হয়, তবু বসে পড়ে বলে—সন্ধ্যা হয়ে এলো, মামুজান উদ্বিগ্ন হবেন।

হেসে ওঠে মুরাদ হাঃ হাঃ করে—কি যে বলেন মিস মনিরা, আপনার মামুজান নিশ্চিন্ত আছেন। আসুন, এই সন্ধ্যেটা আমরা লেকের নিরিবিলিতে কাটিয়ে যাই। মনিরার হাত ধরে আকর্ষণ করে মুরাদ।

মুরাদের কণ্ঠস্বর আর মনোভাব বুঝতে পেরে মনে মনে শিউরে ওঠে মনিরা। অস্বস্তি বোধ করে সে। এ জনহীন নির্জন লেকের ধারে একটা জঘন্য যুবকের পাশে মনিরা নিজকে বড় অসহায় মনে করে। সে হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে।

কিন্তু মুরাদের বলিষ্ঠ হাতের মুঠা থেকে কিছুতেই নিজের হাতখানাকে মুক্ত করে নিতে পারে না মনিরা। ঠিক সে মুহূর্তে কোথা হতে একটা তীরফলক এসে বিঁধে গেল মুরাদের পায়ের কাছে মাটিতে।

মুরাদ মনিরার হাত ছেড়ে দিয়ে তাকালো চারদিকে, কিন্তু কোথাও কোন জনপ্রাণী নজরে পড়ে না।

মুরাদ তীরখানা হাতে উঠিয়ে নিতেই দেখতে পায়, সেটাতে এক টুকরা কাগজ আটকানো রয়েছে। তাড়াতাড়ি কাগজখানা খুলে নিয়ে মেলে ধরে চোখের সম্মুখে। যদিও সন্ধ্যার অন্ধকার ঝাপসা হয়ে এসেছে, তবু বেশ নজরে পড়ে, কাগজখানায় লেখা আছেঃ

'সাবধান'

❑ —দস্যু বনহুর

মুরাদের হাত থেকে কাগজখানা খসে পড়ল! ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল।

মনিরা বুঝতে পারে নিশ্চয়ই এই কাগজে এমন কিছু আছে, যা মুরাদের মত শয়তানকেও ভীত করে তুলেছে। মনিরার মুখখানাও বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে ওঠে। ভয়-জড়িত কণ্ঠে বলে মনিরা—চলুন এবার ফেরা যাক।

ঢোক গিলে বলে মুরাদ—চলুন।

গাড়িতে বসে ভাবে মনিরা, দস্যু বনহুর তাহলে তার পিছু নিয়েছে। কি ভয়ঙ্কর কথা! তবু মনে মনে বনহুরকে ধন্যবাদ না দিয়ে পারে না সে, বনহুর যদি সে মুহূর্তে ঐ তীর ছুঁড়ে সাবধান করে না দিত তাহলে কি যে হত! মুরাদের কবল থেকে কিছুতেই নিজকে রক্ষা করতে পারতো না। মনে প্রাণে খোদাকে ধন্যবাদ জানায় মনিরা।

গাড়িতে বসে আর কোন কথা হয় না। কারণ ইতোপূবে মুরাদ একবার দস্যু বনহুরের কবলে পড়েছিল। কত ভয়ানক এ দস্যু বনহুর সে জানে। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোন রকমে গাড়ি চালিয়ে চলে সে।

❑

দস্যু বনহুরের আস্তানা।

একটা সুউচ্চ আসনে দস্যু বনহুর উপবিষ্ট। সম্মুখে সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান তার অনুচরবৃন্দ। মাঝখানে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, সেখানে স্তূপাকার করে রাখা হয়েছে সেদিনের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি।

বনহুর গম্ভীর কণ্ঠে বলেন—আজ তোমরা যা লুট করে এনেছো তা গরীব-দুঃখীর মধ্যে বিতরণ করে দাও।

একজন বলে ওঠে—সর্দার, এসব বহুমূল্য দ্রব্য।

হুঙ্কার ছাড়ে বনহুর—আমি যা বললাম তাই করবে!

আচ্ছা সর্দার।

বনহুর উঠে দাঁড়ালো—নিয়ে যাও সব।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত অনুচর এক একটা ঝোলা কাধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

বনহুর সোজা চললো বিশ্রামকক্ষে।

কক্ষে প্রবেশ করতেই নূরী এসে দাঁড়ালো পাশে, অভিমানভরা কণ্ঠে বলেন—হুর, আজকাল সব সময় তুমি শহরেই পড়ে থাক কেন বলত?

যখন যেখানে কাজ, সেখানেই থাকি।

তা বলে তুমি আমাকে একা ছেড়ে------

তা'ছাড়া তো কোন উপায় নেই নূরী।

হুর, তুমি না থাকলে আমি বড্ড কষ্ট পাই।

মিছেমিছি কষ্ট পাও কেন বলতো? নাসরীন আছে, সায়রা আছে, রুখসানা আছে...,.

হাজার জন থাক, তবু তোমার অদর্শন অসহনীয় হুর।

নূরী !

হুর তুমি আমার, বলো তুমি আমাকে ভালবাস? বলো, চুপ করে রইলে কেন, বলো?

বাসি।

সত্যি! আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে খুশির আবেগে উঠে দাঁড়ায় নূরী, তারপর হেসে বলে—হুর, অনেকদিন হলো তুমি আমার নাচ দেখতে চাওনা, আজ দেখবে?

যদি তোমার ইচ্ছে হয়, নাচো।

নূরী মনের আনন্দে নাচতে শুরু করলো।

বনহুর আনমনে তাকিয়ে রইলো নূরীর দিকে।

এমন সময় দরজার বাইরে থেকে ডাকলো একজন অনুচর—সর্দার!

কে রহমান? এসো।

নূরীর নাচ থেমে যায়, কক্ষে প্রবেশ করে রহমান—সর্দার!

বলো কি খবর?

সর্দার, পুলিশবাহিনী রহমতকে গ্রেপ্তার করেছে।

বলো কি!

হ্যাঁ সর্দার। আমরা যখন বন্ধনী সেতু পার হচ্ছিলাম, তখন পুলিশ ফোর্স আমাদের ঘেরাও করে ফেলে এবং তুমুল লড়াইয়ের পর আমাদের একজনকে নিহত আর রহমতকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশবাহিনীর দু'জন নিহত হয়েছে।

হুঁ বুঝতে পেরেছি, কিন্তু তোমরা যে ঐ পথে যাবে, একথা পুলিশবাহিনী জানতে পারলো কি করে?

সে কথা আমি জানি না সর্দার।

এবার গর্জে উঠলো বনহুর—তোমরা রহমতকে উদ্ধার না করে ফিরে এলে কেন?

সর্দার, প্রত্যেকটা পুলিশের হাতে গুলিভরা রাইফেল ছিল। তা'ছাড়া---

আমি কোন কথা শুনতে চাইনে, কেন তোমরা তাকে না নিয়ে ফিরে এলে, বলো?

সর্দার! ভীত কণ্ঠস্বর রহমানের।

এমনি কি তারা রহমতকে নিয়ে শহরে পৌঁছে গেছে?

না সর্দার, এখনও তারা পৌঁছতে পারেনি, রহমত গ্রেপ্তার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘোড়া নিয়ে ছুটে এসেছি।

যাও তাজকে প্রস্তুত করো, আমি এক্ষণি যাব।

বেরিয়ে যায় রহমান।

নূরী ছলছল চোখে বনহুরের পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়—তুমি একাই যাবে?

মাথায় পাগড়ী জড়াতে জড়াতে বলে বনহুর—হ্যাঁ।

কিন্তু পুলিশ ফোর্স রয়েছে আর রয়েছে গুলিভরা রাইফেল----

বনহুর কাপুরুষ নয়।

হুর!

এমন সময় পুনরায় রহমান কক্ষে প্রবেশ করে—সর্দার, তাজ প্রস্তুত।

নূরী রিভলবারখানা বনহুরের হাতে তুলে দিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে—খোদা হাফেজ।

পুলিশ ফোর্স রহমতকে বন্দী করে নিয়ে চলেছে। লাশগুলোও তাদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়েছে। গাড়ি উল্কা-বেগে ছুটে চলেছে।

পেছনে ছুটে আসছে তাজের পিঠে দস্যু বনহুর।

একে অন্ধকার রাত, তার ওপর ঝুপঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে, সে সঙ্গে বইছে দমকা হাওয়া। বনহুরের অশ্বপদশব্দ পুলিশদের কানে পৌছে না। অতি নিকটে পৌছে যায় বনহুর!

বনহুর মোটরের আলো লক্ষ্য করে এগুচ্ছে! মাত্র কয়েক মিনিট। বনহুরের অশ্ব খুব কাছে এসে গেছে। হাওয়ার বেগটাও যেন আরও বেড়েছে। সাঁ সাঁ করে শব্দ হচ্ছে। সে শব্দ ভেদ করে বনহুরের অশ্ব এগিয়ে আসছে।

মোটরের পাশ কেটে চলে যায় তাজ, বনহুর লাফিয়ে পড়ে ড্রাইভ আসনে। সঙ্গে সঙ্গে বনহুরের গুলিতে ড্রাইভারের রক্তাক্ত দেহটা মুখ থুবড়ে পড়ে যায় গাড়ির মধ্যে। পুলিশরাও অন্ধকারে গুলি ছুঁড়তে থাকে, কিন্তু

নিজেদের গুলিতে নিজেরাই মরতে লাগলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভয় পেয়ে সমস্ত পুলিশ এদিকে ওদিকে পালিয়ে গেল।

বনহুর রহমতের হাত পায়ের বাঁধন কেটে দিয়ে তুলে নিলো তাজের পিঠে। তারপর ছুটে চললো হাওয়ার বেগে।

পরের দিন এই ঘটনা নিয়ে সারা দেশে হুলস্থূল পড়ে গেল। পুলিশমহলে ভীষণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। মাত্র একজন দস্যু এতগুলো পুলিশকে পরাজিত করে বন্দীকে নিয়ে পালাতে সক্ষম হলো, অথচ কেউ তাকে গ্রেপ্তার করতে পারলো না।

মিঃ হারুন এবং আরও অন্যান্য পুলিশ অফিসার মিলে শংকর রাওয়ের সঙ্গে গোপন আলোচনা চালাতে লাগলেন, কি করে এ দস্যুকে পাকড়াও করা যায়।

শংকর রাও ছদ্মবেশে বেরিয়ে ছিল, সঙ্গে গোপাল বাবুও চললেন। শংকর রাও গ্রাম্য বৃদ্ধের বেশে, গোপাল বাবুর শরীরে ছেঁড়া জামা-কাপড়, ঠিক একজন গ্রাম্য যুবক যেন। শহরের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরেফিরে বেড়াতে লাগলেন তাঁরা।

সারাটা দিন ঘোরাফেরা করে ক্লান্ত হয়ে ছিল। সম্মুখে একটা হোটেল দেখে উঠে ছিল তাঁরা সে হোটেলে।

হোটেলে প্রবেশ করতেই একজন চিৎকার করে উঠলো—ভাগো হিয়াসে।

শংকর রাও বৃদ্ধের অনুকরণে গলার স্বরকে বদলে নিয়ে বলেন—দু'কাপ চা খাব বাবু সাব।

অন্য হোটেল দেখো গে, ভাগো এখান থেকে।

শংকর রাও মনে মনে ভীষণ রেগে গেল। গোপাল বাবুকে সঙ্গে করে হোটেল থেকে বেরুতে যাব, ঠিক সে মুহূর্তে কয়েকজন লোক প্রবেশ করলো হোটেলে।

শঙ্কর রাও থমকে দাঁড়ালেন, লোকগুলোর চেহারা যেন সন্দেহজনক বলে মনে হলো তাঁর কাছে।

শঙ্কর রাও গোপাল বাবুর গা টিপে দিল। তারপর পকেট হাতড়ে দশ টাকার একখানা নোট বের করে এগিয়ে দিল হোটেলের ম্যানেজারের দিকে—শুধু দু'কাপ চা।

ঐ চেয়ারে বসো। হোটেলের ম্যানেজার এক কোণের দুটি চেয়ার দেখিয়ে বলল।

শঙ্কর রাও আর গোপাল বাবু বসে ছিল এক পাশের দুটো চেয়ারে।

যে লোকগুলো কিছু পূর্বে হোটেলে প্রবেশ করেছিল, তারা ওদিকে কয়েকখানা চেয়ারে গোলাকার হয়ে বসে পড়ে।

বয় তাদের সম্মুখে কয়েকখানা মদের বোতল আর পেয়ালা রেখে যায়। মদ পান করতে করতে কি যেন সব আলাপ চলে তাদের মধ্যে। শঙ্কর রাও চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কান পাতেন। কে একজন বলছে—কাজ হাসিল করতে পারলে বহুৎ টাকা মিলবে। এরপর আরও কি কি যেন কথাবার্তা চললো, বুঝা গেল না।

শঙ্কর রাও আর গোপাল বাবু সেদিনের মত পথে নেমে ছিল। সে হোটেল সম্বন্ধে সন্দেহ তাঁদের ঘনীভূত হলো।

পরদিন দু'জনে ভিখারীর বেশে এসে বসলেন, হোটেলের অদূরে বটতলায় একটা কম্বল বিছিয়ে ভিক্ষে শুরু করলেন শঙ্কর রাও ও গোপাল বাবু কিন্তু দৃষ্টি তাঁদের রইলো সে হোটেলের দিকে।

সন্ধ্যে হয় প্রায়। চারদিক ঝাপসা হয়ে এসেছে। লাইটপোস্টগুলো জ্বলে উঠবে একটু পরে, ঠিক সে সময় একটা কালো রঙের মোটর এসে থামলো হোটেলের সম্মুখে।

গাড়ি থেকে নেমে এলো এক কাবুলিওয়ালা। হোটেলে প্রবেশ করতেই হোটেলের ম্যানেজার লোকটাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। আরও কয়েকজন বলিষ্ঠ চেহারার লোক তাকে কুর্ণিশ জানিয়ে হোটেলের ভিতরে নিয়ে গেল।

শঙ্কর রাও আর গোপাল বাবু বটতলা থেকে সব দেখলেন। গোপাল বাবু চোখ টিপে বলেন—শঙ্কর, তুমি যাই বলো, ঐ বেটাই দস্যু বনহুরের লোক।

সত্যি?

আমার সে রকমই মনে হচ্ছে।

❑

আজকাল মুরাদকে আর দাওয়াত করতে হয় না। প্রতিদিন একবার করে চৌধুরীবাড়িতে আসা চাই-ই। যদিও মনিরা তাকে বেশ এড়িয়ে চলে, তবু মুরাদ মনে কিছু করে না, বরং কিসে মনিরা তাকে ভালবাসবে তাই করে। মুরাদ এলে অত্যন্ত খুশি হন চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম।

মনিরাকে মিশার সুযোগ দিয়ে সরে থাকেন তাঁরা, কিন্তু মনিরা সে সুযোগ চায় না, মনে মনে ভীষণ বিরক্ত হয় সে।

মনিরাকে নিয়ে প্রায়ই বেড়াতে যাবার প্রস্তাব করে মুরাদ। চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম খুশিভরা কণ্ঠে সম্মতি জানান, কিন্তু মনিরাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারেন না তাঁরা।

একদিন মনিরা নিজের ঘরে শুয়ে আছে।

মুরাদের গাড়ি এসে থামলো বারান্দায়। চৌধুরী সাহেব তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। মুরাদ জিজ্ঞেস করলো—মনিরা কোথায়?

ব্যস্তকণ্ঠে বলেন চৌধুরী সাহেব—দেখি উপরে আছে বুঝি? তুমি বসো।

আজ বসবো না চৌধুরী সাহেব। কাল আমি বলে গেছি মনিরাকে একটা ফাংশনে নিয়ে যাব। দেখুনতো ওর কাপড়-চোপড় পরা হয়েছে কিনা?

আচ্ছা বাবা—আমি দেখছি। চৌধুরী সাহেব ব্যস্ততার সঙ্গে উপরে উঠে যান। সম্মুখে স্ত্রীকে দেখতে পেয়ে বলেন—মনি কই? মুরাদ এসেছে, ওকে নাকি কোন ফাংশনে নিয়ে যাবে, কালই বলে গেছে বেচারা, দেখতো তৈরি হয়েছে কিনা!

তাই নাকি, সে কথা তো তুমি আমাকে বলোনি, কি যে মেয়ে বাবা মরিয়ম বেগম মনিরার কক্ষের দিকে চলে যান, কিন্তু কক্ষে প্রবেশ করে অবাক হন, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলেন—এ ভরসন্ধ্যায় বিছানায় শুয়ে আছিস কেন মনিরা?

কেন, শুতে দোষ আছে নাকি?

মুরাদ এসেছে!

তাতে আমার কি মামীমা?

সেকি, কাল নাকি সে তোকে বলে গেছে, আজ কোন ফাংশনে যাবে।

কোন ফাংশনে যাবার সখ আমার নেই।

মুরাদ যখন বলছে তখন যা না বাছা।

তা হয় না মামীমা, সে আমার কে যে তার সঙ্গে যাব?

পাগলী মেয়ে! দুদিন পর সে তোর স্বামী.....

মামীমা...চিৎকার করে মরিয়ম বেগমকে থামিয়ে দেয় মনিরা।

মরিয়ম বেগম থ' মেরে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন মনিরার মুখের দিকে, তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে যান!

চৌধুরী সাহেব উন্মুখ হৃদয় নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল, স্ত্রীকে বিষণ্ন মুখে ফিরে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—কি হলো? মনিরা....

ও কথা আমাকে আর বলো না।

সেকি! মুরাদ যে দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে যেতে বলো, মনিরা যাবে না।

কি মুস্কিল! হঠাৎ আবার কি হলো তার?

মাথাটা নাকি বড্ড ধরেছে, কয়েকবার বমিও হয়েছে।

তাই নাকি, তাহলে তো ডাক্তার ডাকতে হয়!

ডাক্তার ডাকার আগে মুরাদকে বিদায় করে দাও।

আচ্ছা বলছি। নিচে নেমে যান চৌধুরী সাহেব।

মুরাদ ঘন ঘন পায়চারী করছিল, চৌধুরী সাহেবকে দেখে এগিয়ে আসে—মনিরা কই?

বড্ড দুঃখের কথা বাবা, মনিরার ভয়ানক জ্বর এসেছে। যেমন বমি তেমনি নাকি মাথাধরা...

হঠাৎ কেমন জ্বর তার?

খুব বেশি।

আমি তাকে একটু দেখতে পারি কি?

হ্যাঁ...না না, তুমি আবার কষ্ট করে....

এতে আর কষ্টের কি আছে, কই চলুন তো একবার দেখে আসি।

তোমার ফাংশনের বিলম্ব হয়ে যাবে।

তা হউক।

চৌধুরী সাহেব কিছু বলার পূর্বেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে চললো মুরাদ।

মরিয়ম বেগম আড়ালে থেকে সব শুনছিল। তিনি ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে বেরিয়ে আসেন—কাল ভোরে এসে দেখে যেও বাবা, এখন একটু ঘুমাচ্ছে।

তা হউক, আমি ওকে জাগাবো না। উপরে উঠে মরিয়ম বেগমকে জিজ্ঞেস করলো মুরাদ—মনিরা কোথায়?

একটা ঢোক গিলে বলেন মরিয়ম বেগম—ঐ যে ঐ ঘরে।

কক্ষে প্রবেশ করে এগিয়ে যায় মুরাদ মনিরার বিছানার দিকে—মনিরা, তোমার নাকি অসুখ? মাথায় হাত দিতে যায় মুরাদ। আজকাল মুরাদ মনিরাকে তুমি বলে সম্বোধন করে।

মনিরা চট করে সরে বসে বলে—খবরদার, গায়ে হাত দেব না।

তোমার নাকি অসুখ?

কে বলেন আমার অসুখ?

দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে চৌধুরী সাহেব আর মরিয়ম বেগমের মুখ অন্ধকার হয়ে যায়।

মুরাদের গলা শোনা যায়—তোমার মামুজান আর মামীমা বলেন।

মিছে কথা! আমার কোন অসুখ করেনি!

থ্যাঙ্ক ইউ, ভেরী গুড। তাহলে তৈরি হয়ে নাওনি কেন?

আমি আপনার সঙ্গে কোথাও যাব না।

মনিরা!

আমি না গেলে আপনি কি করতে পারবেন?

তোমার মামুজান আর মামীমা এর জবাব দেব।

মামুজান আর মামীমার মতে আমার মত নয়—একথা ভুলে যাব না মিঃ মুরাদ।

মনিরা, এত সাহস তোমার?

হ্যাঁ, আমি...কিছু বলতে যাচ্ছিলো মনিরা। সে মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করেন চৌধুরী সাহেব—মনিরা কি হচ্ছে, এসব পাগলামি..

মুরাদ রাগতভাবে বলে ওঠে—চৌধুরী সাহেব, আমি বুঝতে পেরেছি আপনাদের চালাকি। এত মিথ্যাবাদী আপনারা!

মুরাদের অশালীন কথা শুনে ভীষণ রেগে গেল চৌধুরী সাহেব, বলেন—মুরাদ, বিয়ে দেব বলে কথা দিয়েছিলাম, বিয়ে তো আর দেইনি। এখানে তোমার কোন অধিকার নেই। তুমি যেতে পারো।

বেশ, আমিও দেখে নেব, কথা দিয়ে কি করে কথা পাল্টান। বলেই খট খট করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল মুরাদ।

তখনকার মত মুরাদ চলে গেলেও বাইরে থেকে বিষধর সাপের মত ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো, সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে। গুণ্ডাদের আস্তানা হলো তার সম্বল। শয়তানদের সঙ্গে চললো তার গোপন আলোচনা। হাজার হাজার টাকা সে ছড়িয়ে দিতে লাগলো গুণ্ডাদের মধ্যে, যেমন করে হউক মনিরাকে তার চাই।

সেদিন মনিরা কোন এক ফাংশন থেকে ফিরছিল। নিজেদের গাড়ির বিলম্ব দেখে অন্য একটা ভাড়াটিয়া গাড়ি নিয়ে রওনা দিল সে।

গাড়ি ছুটে চলেছে, মনিরা জনমুখর রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। ভাবছিল মুরাদের কথা, জীবন থাকতে অমন অভদ্র লোককে সে স্বামী বলে গ্রহণ করতে পারবে না। এজন্য মামুজান আর মামীমা খুশি নন, তবু কি করবে মনিরা? নিজেকে তো আর বলি দিতে পারে না! ঐশ্বর্যের কাঙ্গাল সে নয়! হঠাৎ মনিরার চিন্তাজাল ছিন্ন হয়ে যায়। গাড়িখানা থেমে পড়েছে।

মনিরা বাইরের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হয়ে যায়, এ তো শহরের পথ নয়। কখন যে গাড়িখানা তাকে নিয়ে এক নির্জন গলির মধ্যে এসে পড়েছে, সে খোয়াল নেই মনিরার।

মনিরা জিজ্ঞেস করলো—ড্রাইভার, এ তুমি কোথায় আনলে?

ড্রাইভার কেমন ধরনের একটা বিদঘুটে হাসি হেসে বলেন—ঠিক জায়গায় এসে গেছি, এখন নেমে পড়ুন দেখি।

ড্রাইভারের কণ্ঠস্বর এবং মুখের ভাব লক্ষ্য করে শিউরে উঠলো মনিরা। বিবর্ণ মুখে সে কিছু বলতে গেল, কিন্তু বাইরে নজর পড়তেই আড়ষ্ট হয়ে গেল তার কণ্ঠ। ভয়ঙ্কর চেহারার কয়েকজন বলিষ্ঠ লোক দাঁড়িয়ে আছে তার দিকে চেয়ে। কেমন যেন দুষ্টমির হাসি তাদের সকলের মুখে।

একজন লোক এগিয়ে এলো গাড়ির পাশে। গম্ভীর কণ্ঠে বলেন সে—নেমে আসুন চট করে।

মনিরার দেহে তখন প্রাণ আছে কি না সন্দেহ। কি করবে এখন সে? এদের হাত থেকে পরিত্রাণের তো কোন উপায় নেই। তবু কণ্ঠে সাহস সঞ্চার করে নিয়ে বলেন—তোমরা আমাকে এখানে নিয়ে এলে কেন? কি তোমাদের উদ্দেশ্য?

তোমার বদলে টাকা চাই। নেমে এসো।

নামবো না, কিছুতেই আমি নামবো না। আমাকে তোমরা বাড়িতে পৌছে দাও, যত টাকা চাও দেব।

হা-হা করে হেসে উঠলো লোকটি—আমরা অত বোকা নই, টাকা আমরা তোমার মামুজানের নিকট হতে চাই না। তোমাকে পেলে টাকার অভাব হবে না।

মনিরা দাঁতে দাঁত পিষে বলে—শয়তান কোথাকার! শিগগির আমাকে বাড়ি পৌছে দাও, নইলে পুলিশে ধরিয়ে দেব। মনিরা নিজকে বাঁচাবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে। কিন্তু দুর্বল অসহায়া একটা রমণীর কথায় ভয় পাবার বান্দা ঐ লোকেরা নয়।

লোকটা পুলিশের নাম শুনে আরও জোরে হেসে ওঠে। তারপর হাসি থামিয়ে বলে—আমি পুলিশের বাবা, পুলিশ আমার কি করবে।

মনিরা চমকে উঠলো, বিস্ময়ভরা ভয়ার্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো—তুমি কে, দস্যু বনহুর?

হ্যাঁ, তুমি দেখছি সহজেই আমাকে চিনে ফেলেছ।

দস্যু বনহুর! বদমাইশ কোথাকার। বহুদিন থেকে তুমি আমার পেছনে লেগেছ। আমি মরবো, তবু তোমার হাতে নিজকে সঁপে দেব না।

দেখি কেমন করে না দাও। বলিষ্ঠ লোকটা গাড়ির দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলো এবং জোরপূর্বক মনিরাকে টেনে নামিয়ে ফেললো।

মনিরা ভয়ার্ত কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো—বাঁচাও, বাঁচাও, বাঁচাও.....

ঠিক সে মুহূর্তে আর একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে এবং সংগে সংগে একটা যুবক ট্যাক্সি থেকে নেমে এসে ঝাঁপিয়ে ছিল বলিষ্ঠ লোকটার ওপর। গুণ্ডার দল হঠাৎ এই বিপদের জন্য প্রস্তুত ছিল না, যে যেদিকে পারলো ছুটে পালালো। বলিষ্ঠ লোকটা আর যুবকে চললো ভীষণ ধস্তাধস্তি। বেশ কিছুক্ষণ লড়াইয়ের পর বলিষ্ঠ লোকটা কাবু হয়ে এলো, সে পরাজিত হয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিল।

গলিটার মধ্যে অন্ধকার তখন জমাট বেঁধে উঠেছে! মনিরা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছিল, আর যুবকটার মঙ্গল কামনা করছিল। ঠিক এই সময়ে যুবকটা যদি এসে না পড়তো তবে কি হত, ভাবতে পারে না সে।

ভয়ঙ্কর লোকটা পরাজিত হয়ে পালিয়ে যেতেই মনিরা ছুটে গেল যুবকের পাশে। বিনীতকণ্ঠে বলেন—আপনার শরীরে আঘাত লাগেনি তো?

যুবক সোজা হয়ে দাঁড়াতেই মনিরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। পাশের লাইটপোস্টের আলোতে সে দেখলো—প্যান্ট কোট টাই পরা একটা যুবক—অদ্ভুত অপূর্ব সুন্দর তার চেহারা।

যুবক অন্য কেউ নয় দস্যু বনহুর। সে দূর থেকে মনিরার গাড়িখানাকে লক্ষ্য করছিল, কিন্তু পথের মধ্যে হঠাৎ একটা এক্সিডেন্ট হয়, সে কারণে কিছু বিলম্ব হয় তার। তবু ঠিক সময়ে পৌঁছতে পেরেছে বলে মনে খুশি হয়েছে। বনহুর বিস্ময়ভরা নয়নে তাকিয়ে আছে মনিরার মুখের দিকে।

মনিরা সম্বিৎ ফিরে পায়। দৃষ্টি নত করে নিয়ে বলে— কি বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ দেব ভেবে পাচ্ছিনে, আপনি আমার জীবন রক্ষা করেছেন!

হেসে বলে বনহুর— আপনাকে শয়তানের কবল থেকে রক্ষা করতে পেরে নিজেও কম আনন্দিত হইনি।

ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে চারদিকে তাকালো মনিরা। তারপর চাপাকণ্ঠে বলেন— জানেন ওরা কে?

না তো, আমি কি করে জানবো?

দস্যু বনহুর আমাকে আক্রমণ করেছিল!

সত্যি!

হ্যাঁ, আপনি না এলে আমার উদ্ধার ছিল না, জানেন তো দস্যু বনহুর কত ভয়ঙ্কর!

হেসে বলে বনহুর— হ্যাঁ, দস্যু বনহুরের নাম শুনেছিলাম, আজ তার সঙ্গে লড়াই হলো।

আপনার বীরত্বে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনি কি করে যে অমন ভয়ঙ্কর দস্যুটাকে পরাজিত করলেন।

আর এখানে বিলম্ব করা ঠিক নয়, দস্যু বনহুর আবার হানা দিতে পারে। চলুন, আমার গাড়িতে আপনাকে পৌঁছে দি।

চলুন।

বনহুর নিজের গাড়ির দরজা খুলে ধরে— উঠুন।

মনিরার মাথাটা শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে— কত ভদ্র, মহৎ এই যুবক! গাড়িতে উঠে বসে মনিরা।

বনহুর ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

গাড়িতে বসে মনিরা এই যুবকটির কথা ভাবছে। তার জীবনে এই যুবকটি যেন খোদার একটি দান। বারবার যুবকের মুখখানা দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে তার।

❑

বনহুর ড্রাইভ আসন থেকে হাত বাড়িয়ে পেছন সীটের দরজা খুলে ধরলো- চৌধুরীবাড়ি এই শহরের সবাই চেনে। নামুন, বাড়িতে যান।

আপনি নামবেন না?

আজ নয়, আর একদিন।

গাড়ি-বারান্দার উজ্জ্বল আলোতে মনিরা ভালো করে দেখলো বনহুরকে। মন যেন ওকে ছেড়ে দিতে চাইলো না, কিন্তু অপরিচিত এক যুবকের কাছে কি অধিকার আছে তার!

বনহুর গাড়িতে স্টার্ট দিল, মনিরা তখনও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের মুখের দিকে।

গাড়িখানা দৃষ্টির আড়ালে চলে যেতেই মনিরা হলঘরে প্রবেশ করলো।

চৌধুরী সাহেব একটা পত্রিকা দেখছিল, মনিরার পদশব্দে কাগজখানা রেখে মুখ তুলেন—একি মা, এত রাত হলো যে?

মনিরা তাঁর পাশের সোফায় বসে পড়ে বলেন— মামুজান, জীবনে যে বেঁচে ফিরে এসেছি, এই ভাগ্য।

কেন মা, কোন এক্সিডেন্ট----

না মামুজান, দস্যু বনহুর আমাকে আক্রমণ করেছিল।

বলিস কি মনি দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ, ভাগ্যিস এক ভদ্র যুবক আমাকে বাঁচিয়ে নিলেন, নইলে আর কোনদিন তোমরা আমাকে ফিরে পেতে না।

ওগো শুনছো? শুনো, শুনো--- চৌধুরী সাহেব স্ত্রীকে ডাকাডাকি শুরু করলেন।

মরিয়ম বেগম এবং চৌধুরী সাহেব মনিরার মুখে সমস্ত ঘটনা শুনে আড়ষ্ট হয়ে গেল, মুখে যেন তাঁদের কথা নেই।

কিছক্ষণ লাগলো তাঁদের নিজেদের সামলাতে। কি ভয়ঙ্কর কথা! প্রকৃতিস্থ হয়ে বলেন চৌধুরী সাহেব মনি, যে তোমাকে রক্ষা করলো তাকে ঘরের দরজায় এসে ওভাবে ছেড়ে দেয়া তোমার উচিত হয়নি মা।

মরিয়ম বেগম স্বামীর কথায় যোগ দিল— শুধু রক্ষা নয়, মনিরার জীবন আমাদের মান-ইজ্জত সব বাঁচিয়েছে সে। মনিরা, তুমি শিক্ষিত মেয়ে, কি করে বিদায় দিলে? মনে একটু বাঁধলো না?

আমি তাকে নামতে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু উনি বলেন— আজ নয়, অন্য দিন আসবেন।

পাগলী মেয়ে, তাই বুঝি তুই তাকে ছেড়ে দিলি? জিদ করলে নিশ্চয়ই সে না নেমে পারতো না।

ভুল হয়েছে মামীমা।

এবার চৌধুরী সাহেব বলেন— তার পরিচয়টা জেনে নেয়াও কি তোমার উচিত ছিল না? কি তার নাম, কোথায় থাকে---

মামুজান, আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম।

সত্যি, গো, দস্যু বনহুরের কবলে— এ যে কী সাংঘাতিক ব্যাপার, ভাবলেও আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠছে। মনিরা, কোনদিন তুই একা বাইরে যাবিনে।

হ্যাঁ মামীমা, আর অমন কাজ করবো না।

❑

সেদিন মনিরা একটা বইয়ের দোকানে প্রবেশ করলো কতকগুলো বইয়ের অর্ডার দিয়ে দাঁড়িয়েছে, এমন সময় তার পাশে দাঁড়ালো এক যুবক, মনিরা মুখ তুলে তাকাতেই তার চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো, হেসে বলেন— আপনি?

বনহুর বলে ওঠে— আপনি দেখি আমাকে মনে রেখেছেন?

কি যে বলেন, কোনদিনই আপনাকে ভুলবো না। কি বাঁচাই না সেদিন আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন! আজ কিন্তু আর আপনাকে ছাড়ছিনে।

তার মানে?

মানে অতি স্বচ্ছ। মামুজানের হুকুম, আপনাকে তাঁর নিকটে ধরে নিয়ে যেতে হবে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ, সেদিন আপনাকে বিদায় দিয়ে কি বকাটাই না খেলাম। যেমন বকলেন মামুজান, তেমনি মামীমা!

তাহলে তো এক বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে আর এক বিপদে পড়েছিল?

মিথ্যে নয়। হ্যাঁ একটা কথা, মনে কিছু নেবেন না?

বলুন?

আপনার পরিচয়টা?

ওঃ হ্যাঁ, পরিচয়টা এখনও আপনাকে দেয়া হয়নি। আমার নাম মনিরুজ্জামান চৌধুরী, ঠিকানা ৩৬/৩, বাগবান রোড চলুন না আজ আমার বাড়িতে, এই তো এখান থেকে একটু দূরে।

না না, তা হয় না। আপনিই আজ চলুন, পরে একদিন নিশ্চয়ই আপনার ওখানে যাব।

কিন্তু আমি তো আজ যেতে পারছিনে মিস মনিরা!

অবাক হয়ে তাকায় মনিরা বনহুরের মুখে। বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বলে— আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?

হেসে বলে বনহুর— কারও নাম জানতে ইচ্ছে থাকলে অমনি জানা যায়। সেদিন আমি জেনে নিয়েছি।

বেশ লোক কিন্তু আপনি।

বনহুর আর মনিরা একসঙ্গে হাসতে থাকে।

বইগুলো প্যাক করে মনিরার সম্মুখে রাখে দোকানদার।

মনিরা ক্যাশমেমো দেখে টাকা মিটিয়ে দেয়, তারপর বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে— আজ কথা দিতে হবে, কবে তাহলে আসছেন?

আমার বাড়ির এত নিকটে এসে যখন চলে যাচ্ছেন তখন আমার যাওয়া-- তা যাব একদিন।

না, তা হবে না।

তাহলে---

আচ্ছা চলুন।

মনিরা বনহুরের গাড়িতে চেপে বসে।

ড্রাইভ আসনে ওঠে বনহুর। গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বলে— অজানা অচেনা একজনের সঙ্গে যেতে মনে ভয় হচ্ছে বুঝি?

কি যে বলেন— আপনার সঙ্গে ভয়, আপনি তো ডাকাতের বাবা!

তাহলে ভরসা আছে আমার ওপর?

খুব।

আরও অনেক হাসিগল্প চলে।

বিরাট একটা বাড়ির সম্মুখে এসে বনহুরের গাড়ি থেমে ছিল।

মনিরা বাড়িখানার দিকে তাকিয়ে অবাক হলো— এ যেন রাজ প্রাসাদ।

বনহুর ড্রাইভ আসন থেকে নেমে গাড়ির দরজা খুলে ধরলো— নেমে পড়ুন।

মনিরা নেমে দাঁড়ালো।

বনহুর মনিরাকে নিয়ে এগুতেই দারোয়ান সেলুট ঠুকে সরে দাঁড়ালো।

মনিরা অবাক হয়ে চারদিকে দেখতে দেখতে এগুতে লাগলো। সেকি প্রকাণ্ড বাড়ি! গেটের পর গেট, ঘরের পর ঘর। প্রত্যেকটা ঘরে বেলওয়ারীর

ঝাড় ঝুলছে। মূল্যবান সরঞ্জামে ঘরগুলো সাজানো, কিন্তু মনিরা আশ্চর্য হলো, এত বড় বাড়িটায় শুধুমাত্র ঐ একটা যুবক।

অনেকগুলো ব্যালকনি পেরিয়ে একটা সুসজ্জিত কক্ষে প্রবেশ করলো মনিরাকে নিয়ে বনহুর। মনিরা তখনও অবাক হয়ে চারদিকে দেখছে। তার মামুজানও মস্ত বড়লোক, কিন্তু এত বড় বাড়ি তো তাদের নয়। রাজ-রাজার বাড়ি যেমন হয়, এ বাড়িটাও ঠিক তেমনি।

বনহুর হেসে বলেন—বসুন।

মনিরা বসে পড়ে বলে— এত বড় বাড়ি অথচ লোকজন তো দেখছিনে? আপনার বাবা-মা?

কেউ নেই।

আপনার স্ত্রী, ছেলেমেয়ে?

ওসব ঝঞ্ঝাটও নেই আমার।

এত বড় বাড়িটায় আপনি একা থাকেন?

চিরদিন যে একা, সে কোথায় পাবে সঙ্গী, বলুন। ঃ আপনি বসুন, আমি একটু চা-নাস্তার ব্যবস্থা---

না না, ওসব কিছু লাগবে না, বরং আপনি বসুন।

তা হয় না মিস মনিরা, আপনি আমার অতিথি। বনহুর বেরিয়ে যায়।

মনিরা অবাক হয়ে ভাবে, অদ্ভুত এই যুবক। যার এত আছে, তার আবার সঙ্গীর ভাবনা? রূপ-গুণ-ঐশ্বর্য সব আছে এর কিন্তু কেন সে একা নিঃসঙ্গভাবে জীবন কাটায়? ইচ্ছে করলেই যে কোন মেয়েকে সে গ্রহণ করতে পারে। যে নারী ওকে স্বামীরূপে পাবে সে ধন্য হবে, সার্থক হবে তার জীবন কিন্তু কেন সে এতদিনও বিয়ে করেনি?

মনিরা আনমনে উঠে দাঁড়ায়। ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে কক্ষ থেকে। ওপাশে রেলিংয়ের ধারে দাঁড়াতেই আশ্চর্য হয়। কত রকমের ফুলগাছ শোভা পাচ্ছে বাগানে। ফুরফুরে হাওয়া আর অজানা ফুলের সুরভি তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালো। মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে আছে মনিরা।

কখন যে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বনহুর, খেয়াল করতে পারেনি মনিরা। বনহুর হেসে বলে— কি দেখছেন অমন করে?

কি সুন্দর— অপূর্ব! আচ্ছা জামান সাহেব, আপনি ফুল বুঝি খুব ভালবাসেন?

হ্যাঁ চলুন, চা-ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

কেন আপনি ওসব ঝামেলা করতে গেল! পায়ে পায়ে এগিয়ে চলে মনিরা আর বনহুর।

চা-নাস্তার সঙ্গে সঙ্গে বনহুর আর মনিরার গল্প চলে। মনিরা এখন অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে এসেছে। বনহুরের দৃষ্টির মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছে সে। বনহুরের হাসির মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে নিজকে। কথায় কথায় সন্ধ্যা হয়ে আসে, সেদিকে খেয়াল নেই মনিরার। বনহুর স্মরণ করিয়ে দেয়— মিস মনিরা, আপনার ফেরার সময় হয়েছে, বিলম্ব হলে আপনার মামুজান নিশ্চয় চিন্তিত হবেন।

উঠে দাঁড়ায় মনিরা— সত্যি আমার যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

বনহুর একটু হাসলো।

মনিরা আর বনহুর গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো। মনিরা বলেন— জামান সাহেব, আপনি আমাকে পৌঁছে দিচ্ছেন তো?

আমি ড্রাইভার দিচ্ছি, সে আপনাকে ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে।

না, তা হবে না! আমি কোন ড্রাইভারকে বিশ্বাস করি না।

হো হো করে হেসে ওঠে বনহুর— খুব ভয় পেয়ে গেছেন দেখছি। কিন্তু আমাকেই বা আপনার এত বিশ্বাস কেন? আমি যদি আপনাকে নিয়ে পালাই?

পৃথিবীর কাউকে বিশ্বাস না করলেও আপনার ওপর আমার অবিশ্বাস হবে না। সত্যি জামান সাহেব, আপনি কত মহৎ!

বুঝেছি, আপনি আমাকে আজই আপনার মামুজানের নিকটে হাজির করতে চান।

তাহলে আপনি বুঝতে পেরেছেন আমার মনোভাব, চলুন।

বনহুর আর বিলম্ব না করে ড্রাইভ আসনে উঠে বসে।

❑

চৌধুরীবাড়ি।

চৌধুরী সাহেব, পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও ও গোপাল বাবু মিলে আলোচনা চলছিল। কয়েকদিন পূর্বে মনিরার সে আক্রমণ ব্যাপার নিয়েই আলোচনা চলছিল। দস্যু বনহুর যে হঠাৎ ওভাবে মনিরার ওপর হামলা করে বসবে, এ যেন একটা অদ্ভুত ব্যাপার। চৌধুরী সাহেব কন্যা-সমতুল্যা ভাগনীকে নিয়ে খুব চিন্তায় ছিল। দস্যু বনহুরের দৃষ্টি যে তার ওপর পড়েছে, এ বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। কি করে এ দস্যুর

কবল থেকে মনিরাকে রক্ষা করা যাবে, এ নিয়ে আজ ক'দিন হলো পুলিশ অফিসে ঘোরাফেরা করছেন। আজ নিজে যেতে না পারায় ফোনে মিঃ হারুন সাহেবকে চৌধুরীবাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিল। যখন চৌধুরী সাহেব পুলিশ অফিসে ফোন করেন, তখন মিঃ হারুনের পাশে রাও এবং গোপাল বাবু উপস্থিত ছিল।

শঙ্কর রাও মিঃ হারুনের নিকট ঘটনাটা শুনে থাকতে পারলেন না, তিনিও গোপাল বাবুকে নিয়ে মিঃ হারুনের সঙ্গে চৌধুরীবাড়িতে উপস্থিত হলেন।

সবাই মিলে আলোচনা চলছে, এমন সময় কক্ষে প্রবেশ করে মনিরা আর বনহুর। মনিরা আনন্দভরা কণ্ঠে বলে ওঠে— মামুজান, ইনিই সেদিন আমাকে দস্যু বনহুরের কবল থেকে রক্ষা করেছিল।

সকলেই একসঙ্গে বনহুরের মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

চৌধুরী সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বনহুরকে জড়িয়ে ধরেন বুকে। তারপর আনন্দভরা কণ্ঠে বলেন— আপনাকে কি বলে যে আমি কৃতজ্ঞতা জানাবো ভেবে পাচ্ছিনে। আপনি আমার মান-ইজ্জত রক্ষা করেছেন, আপনার কাছে আমি চিরঋণী।

পিতা-পুত্রের অপূর্ব মিলন। বনহুরের চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে। কেউ না জানলেও সে জানে— চৌধুরী সাহেবই তার পিতা। মনে মনে পিতাকে হাজার সালাম জানায় বনহুর।

চৌধুরী সাহেবও হৃদয়ে একটা আলোড়ন অনুভব করেন, বনহুরকে কিছুতেই বুক থেকে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে না তাঁর।

মামুজান আর জামান সাহেবের মিলনে মনিরার চোখ দুটো আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, খুশির আবেগে বেরিয়ে যায় সে।

এবার চৌধুরী সাহেব বনহুরকে পাশের সোফায় বসিয়ে দিয়ে নিজেও বসে পড়েন।

বনহুরের অপূর্ব সৌন্দর্য সকলকে মুগ্ধ করে ফেলে। মনিরা বয়ের হাতে চায়ের সরঞ্জাম দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে। চৌধুরী সাহেব কিছু জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন বনহুরকে, কিন্তু মনিরাই সকলের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল।

বনহুর সকলের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে আসন গ্রহণ করলো।

মনিরা হেসে বলেন— মামুজান, উনি কিন্তু মস্ত বড়লোক।

বনহুর লজ্জিতকণ্ঠে বলেন— মিছেমিছে বাড়িয়ে বলছেন মিস মনিরা।

না মামুজান, আমি এতটুকু বাড়িয়ে বলিনি।

হাসিগল্পের মধ্য দিয়ে চা-নাস্তা চলে।

চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলেন শঙ্কর রাও— মিঃ মনিরুজ্জামান, আমি আপনাকে একটু বিরক্ত করবো। কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবো।

স্বচ্ছন্দে করুন।

শঙ্কর রাও একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বলেন— আচ্ছা মিঃ জামান, আপনি মিস মনিরাকে উদ্ধারের জন্য যখন নিজের গাড়ি থেকে দস্যুদলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন, তখন তাদের দলে কত জন ছিল বলে আপনার মনে হয়?

বনহুর ভ্রূকুঞ্চিত করে একটু চিন্তা করলো, তারপর বলেন—পাঁচ ছ'জন হবে।

ওরা কি সকলেই আপনাকে আক্রমণ করেছিল?

না, আমাকে দেখামাত্র সবাই সরে পড়ে। শুধু একজন, দলের সর্দার হবে হয়তো, সে আমাকে আক্রমণ করেছিল।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন— মিঃ জামান, আপনার কি মনে হয়, সে লোকটাই দস্যু বনহুর?

বনহুর একটা চিন্তার ভান করে বলে— আমি তো আর দস্যু বনহুরকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করিনি, তবে অনুমানে এবং তার ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে মনে হলো বনহুর ছাড়া আর কেউ সে নয়। ইস, কি শক্তিই না তার শরীরে!

চৌধুরী সাহেব হেসে বলেন— আপনার কাছে হার মানাতে সে বাধ্য হলো। পরাজিত হলো আপনার নিকট।

আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মিঃ জামান, দস্যু বনহুরকে পরাজিত করে মিস মনিরাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন। কথাটা বলে বনহুরের পিঠ চাপড়ে দেন মিঃ হারুন। একটু থেমে পুনরায় বলেন— আশা করি দস্যু বনহুরের গ্রেপ্তারে আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, প্রয়োজন মত আমাকে পাবেন।

মিঃ শঙ্কর রাও বলেন— হ্যাঁ মিঃ জামান, আপনি যদি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারে আমাদের সাহায্য করেন, তবে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

মনিরা তন্ময় হয়ে তাকিয়ে ছিল বনহুরের মুখের দিকে। বনহুর সকলের অলক্ষ্যে একবার তাকালো মনিরার মুখে। দৃষ্টি বিনিময় হলো। দু'জনের অন্তর যেন দু'জনকে দেখতে পেল। অভূতপূর্ব আকর্ষণ অনুভব করলো মনে তারা।

বনহুর মৃদু হেসে উঠে দাঁড়ালো— আজ তাহলে চলি।

চৌধুরী সাহেবও উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যেন হৃদয়ে একটা ব্যথা অনুভব করলেন। শান্ত মিষ্টি গলায় বলেন— আবার কবে আসবেন কথা দিন?

ঠিক বলতে না পারলেও, আসবো। আর একবার তাকালো বনহুর মনিরার দিকে। মনিরা দৃষ্টির মাধ্যমে ওকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

এরপর হতে প্রায়ই আসে বনহুর।

চৌধুরী সাহেব, মরিয়ম বেগম সবাই বনহুরকে ভালবেসে ফেলেছেন। বনহুর এলে তাঁরা যেন মনে শান্তি অনুভব করেন, মনিরার তো আনন্দ ধরে না। যেদিন বনহুর আসার কথা থাকে, সেদিন মনিরা নিজেকে মনের মত করে সাজায়, সকাল থেকে গুন গুন করে গান গায়।

চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম বুঝতে পারেন ভাগ্নীর মনোভাব। তাঁরা উভয়ে উভয়ের মুখে তাকিয়ে হাসেন, অজ্ঞাত এক বাসনা উঁকি দিয়ে যায় তাঁদের মনের কোণে।

মুরাদ সেদিন রাগ করে চলে যাবার পর থেকে চৌধুরী সাহেব ভিতরে ভিতরে ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করছিল, বনহুরের আবির্ভাব আবার তাঁর হৃদয়ে শান্তির প্রলেপ এনে দেয়। চৌধুরী সাহেব ধীরে ধীরে ভুলে যান মুরাদকে।

একদিন বিকেলে বনহুরের সঙ্গে মনিরা বেড়াতে বেরুলো। সে লেকের ধারে গিয়ে গাড়ি থেকে নামলো তারা। পাশাপাশি এগিয়ে চললো মনিরা আর বনহুর। কি নিয়ে যেন দু'জন বেশ হাসছিল।

মুরাদ দূর থেকে মনিরা আর বনহুরকে লক্ষ্য করলো। হিংসায় জ্বলে উঠলো তার অন্তরটা, কট্‌মট্ করে তাকিয়ে রইলো ওদের দিকে।

বনহুর বলেন— মিস মনিরা, চেয়ে দেখুন ঐ অস্তগামী সূর্যের দিকে।

হেসে বলেন মনিরা—অপূর্ব!

ঠিক আপনার রক্তিম গণ্ডের মত— তাই না?

যান!

মিস মনিরা, সত্যি আপনার মত মেয়েকে আমার বড্ড ভালো লাগে— চোখে লজ্জা, মনে নম্রতা, মিষ্টিমধুর কণ্ঠস্বর—অপরূপ!

মনিরার মন তখন চলে গেছে পেছনের একটি দিনে। মুরাদ আর সে পাশাপাশি বসে আছে এমনি এক সন্ধ্যায়। মুরাদ বলছে, মনিরা তুমি বড্ড লাজুক, একদম সেকেলে ধরনের— কি বিশ্রী, কি কুৎসিত ইঙ্গিতপূর্ণ কণ্ঠস্বর মুরাদের।

কি ভাবছেন মিস মনিরা?

মিস নয়, শুধু মনিরা বলুন।

তুমি যদি খুশি হও তাহলে তাই হবে। এবার বলো কি ভাবছো?

বনহুর মনিরাকে তুমি বলে সম্বোধন করে। মনিরাও বনহুরকে তুমি বলে সম্বোধন করে। কারণ ওরা দু'জন দু'জনের মনে গভীরভাবে দাগ কেটেছে। দু'জন দু'জনকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেলেছে।

নাই বা শুনলে সে কথা!

যদি না বলার মত হয়, তাহলে আমি শুনতে চাইনে মনিরা।

ঠিক সে মুহূর্তে মুরাদ মনিরার পেছনে এসে দাঁড়ালো, কঠিন কণ্ঠে বলেন— মিস মনিরা, কে এই যুবক?

মনিরা উঠে দাঁড়ালো, সেও কঠিন কণ্ঠে বলেন— আপনি সে কথা জিজ্ঞাসা করার কে?

তোমার আব্বা একদিন আমার সঙ্গে তোমাকে বিয়ে দেবেন কথা দিয়েছিল— একথা এরই মধ্যে ভুলে গেলে? সেই অধিকারে--

খবরদার, আর কথা বলবেন না, চলে যান এখান থেকে।

ওঃ আজ দেখছি বড্ড সাহস বেড়েছে? চলো, তোমার আব্বার কাছে নিয়ে এর জবাব দেব--- মনিরার হাত ধরতে যায় মুরাদ।

সঙ্গে সঙ্গে বনহুর প্রচণ্ড এক ঘুসি বসিয়ে দেয় মুরাদের নাকে। মুরাদ পড়ে যায়, নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। ধূলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে হাতের পিঠে নাকের রক্ত মুছে, তারপর বনহুর আর মনিরার দিকে কট্‌মট্ করে তাকিয়ে চলে যায়।

হেসে ওঠে মনিরা, বনহুরের প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে তার মন।

বনহুর বসতে যায়। মনিরা বলে— ওখানে বসে আর কাজ নেই, চলো এবার ফেরা যাক।

কেন, ভয় হচ্ছে?

না, তুমি পাশে থাকলে আমার কোন ভয় নেই। তবু চলো এখানে বসতে মন আর চাইছে না।

চলো তাহলে।

❑

সন্ধ্যা ঘনিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। মনিরা সাজগোজ করে ড্রইং রুমে বসে বসে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছে আর বারবার তাকাচ্ছে দেয়াল ঘড়িটার দিকে।

আজ রাত সাড়ে আটটায় এক বান্ধবীর বাড়িতে তার দাওয়াত আছে। মনিরা বনহুরকে বলে দিয়েছে— অবশ্য অবশ্য সে যেন গাড়ি নিয়ে আসে, তার গাড়িতেই যাবে মনিরা। নইলে সন্ধ্যার পর বাইরে বেরুবার সাহস নেই তার। চৌধুরী সাহেবও বারণ করে দিয়েছেন।

মনিরা উদ্বিগ্নভাবে পায়চারী শুরু করে, হাতঘড়ির দিকে তাকায়— আটটা বেজে গেছে।

এমন সময় গাড়ি-বারান্দায় মোটর থামার শব্দ হয়। পরক্ষণেই কক্ষে প্রবেশ করে বনহুর, হাস্যোজ্জ্বল মুখে বলে— বড্ড দেরী হয়ে গেছে, না?

মনিরা টেবিল থেকে ভ্যানিটি ব্যাগটা হাতে উঠিয়ে নিয়ে বলে— চলো।

অমনি মরিয়ম বেগম দু'জনের পাশে এসে দাঁড়ান। বনহুরকে লক্ষ্য করে বলেন— দেখ বাবা, তোমার ওপর ভরসা করেই ওকে বাইরে পাঠাচ্ছি। দস্যু বনহুরের ভয়ে আমার তো কণ্ঠনালী শুকিয়ে গেছে, আবার না সে মনির ওপর হামলা করে বসে।

মরিয়ম বেগমের ব্যথাকাতর কণ্ঠস্বর বনহুরের হৃদয়ে আঘাত করলো। তার মা, তার গর্ভধারিণী জননী আজ তারই ভয়ে ভীত। আজ তাঁর নিকটে পুত্র পরিচয় দেবার কোন অধিকার নেই। বনহুরের চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো। তার অবাধ্য কণ্ঠ দিয়ে হঠাৎ একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এলো— মা।

মরিয়ম বেগম বিস্ময়ভরা চোখে তাকালেন বনহুরের মুখে। এই মা ডাক তাঁর প্রাণে এক অপূর্ব শিহরণ জাগালো। মাতৃহৃদয় আকুলি বাকুলি করে উঠলো। তিনি আর চুপ থাকতে পারলেন না। জবাব দিল— বল বাবা?

বনহুর ততক্ষণে সামলে নিয়েছে। হেসে বলেন— দস্যু বনহুর আপনার কোন অন্যায় করবে না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

যাও বাবা, ওদিকে মনিরার সময় হয়ে এলো।

চলো মনিরা।

বনহুর আর মনিরা পাশাপাশি ড্রাইভ আসনে ওঠে বসলো। জনমুখর রাজপথ ধরে গাড়ি ছুটে চলেছে।

মনিরার শাড়ির আঁচলখানা বারবার বনহুরের গায়ে উড়ে উড়ে পড়ছিল। একটা সুমিষ্ট গন্ধ, বনহুরের প্রাণে দোলা লাগে।

বনহুর মৃদু হেসে বলে— মনিরা!

বলো?

এই নির্জন গাড়ির মধ্যে যদি মিঃ জামান না হয়ে দস্যু বনহুর থাকতো তোমার পাশে?

মনিরা দক্ষিণ হাতে বনহুরের মুখ চেপে ধরে— ও নাম তুমি মুখে এনো না, ভয়ে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।

মনিরা!

বলো?

দস্যু বনহুর কি মানুষ নয়?

মনিরা বনহুরের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে— ওসব আলোচনা না-ই বা করলে।

মনিরা, ধর বনহুর তোমাকে খুব ভালবেসে ফেলেছে, তার প্রতিদানে তাকে তুমি ভালবাসতে পারো না?

ছিঃ এসব কি বলছো? যে মানুষ নামের কলঙ্ক, তাকে নিয়ে তুমি ঠাট্টা করছো—

মনিরা! অস্ফুট ধ্বনি করে ওঠে বনহুর।

মনিরা চমকে উঠে বলে— কি হলো?

কিছু না। ব্রেক কষে গাড়ি থামিয়ে ফেলে— এসে গেছি।

❑

বনহুর আর মনিরা কক্ষ থেকে চলে যাবার পর মরিয়ম বেগম সোফায় বসতে যাবেন, হঠাৎ সোফার পাশে একখানা নীল রঙের কাগজ পড়ে আছে দেখতে পান।

কাগজখানা হাতে উঠিয়ে নিয়েই চমকে ওঠেন। তাতে লেখা রয়েছে-

'আজ রাতে আমি আসবো'

—দস্যু বনহুর

মরিয়ম বেগমের কম্পিত হাত থেকে কাগজখানা পড়ে যায়। ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যান তিনি।

কিছুক্ষণের মধ্যে চৌধুরী সাহেব এসে পড়েন। স্ত্রীকে বিবর্ণ মুখে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞেস করেন— অমন গম্ভীর হয়ে বসে আছ কেন?

মরিয়ম বেগম আংগুল দিয়ে কাগজখানা দেখিয়ে দেন।

চৌধুরী সাহেব কাগজখানা হাতে উঠিয়ে নিয়ে দৃষ্টি বুলাতেই থ' হয়ে গেছেন, ঢোক গিলে বলেন— তাহলে উপায়?

মরিয়ম বেগম বলেন— এক্ষুণি পুলিশে খবর দাও।

ঠিক বলেছ। চৌধুরীসাহেব কালবিলম্ব না করে পুলিশ অফিসে ফোন করলেন। এইমাত্র দস্যু বনহুরের চিঠি পেয়েছি আমরা তো ভীষণ ভয় পাচ্ছি, মনিরাকে নিয়ে আমাদের যত ভাবনা। মিঃ হারুন, আপনিই এখন আমাদের ভরসা।

মনিরাকে নিয়ে বনহুর যখন ফিরে এলো, তখন চৌধুরীবাড়ি পুলিশে ভরে গেছে। মিঃ হারুন উদ্বিগ্নভাবে পায়চারী করছেন আর বলছেন— চৌধুরী সাহেব, এই ঘটনার পরও মনিরাকে সন্ধ্যার পর বাইরে পাঠানো আপনার উচিত হয়নি।

চৌধুরী সাহেব স্বাভাবিক কণ্ঠে জবাব দেন— ইন্সপেক্টার সাহেব, মনিরার সঙ্গে জামান আছে, সে সঙ্গে থাকলে ইনশাআল্লাহ-আমাদের আশঙ্কা করার কিছু নেই।

এসব আলোচনা চলছে, ঠিক সে সময় বনহুর আর মনিরা হাস্যোজ্জ্বল মুখে কক্ষে প্রবেশ করলো।

চৌধুরী সাহেব কলকণ্ঠে বলে ওঠেন— ঐ যে মনি এসে গেছে? দেখুন ইন্সপেক্টার সাহেব, আমি বললাম না আমাদের জামান থাকতে ওর কোন চিন্তা নেই।

একথা মিথ্যে নয় চৌধুরী সাহেব। জামান সাহেব সত্যই একজন বীর পুরুষ। কথাটা বলেন মিঃ হারুন।

মনিরা ব্যগ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করে— মামুজান, হঠাৎ ইনারা? আমি কিছু বুঝতে পারছিনে?

চৌধুরী সাহেব ভয়ার্তকণ্ঠে বলেন— ভয়ঙ্কর একটা ঘটনা ঘটে গেছে।

বনহুর আশ্চর্য হবার ভান করে বলে— ভয়ঙ্কর ঘটনা! বলছেন কি? হঠাৎ কি ঘটলো?

এই দেখ! চৌধুরী সাহেব নীল রঙের কাগজখানা পকেট থেকে বের করে বনহুরের হাতে দেন।

বনহুরের মুখে মৃদু হাসি ফুটে ওঠে। কাগজখানা চৌধুরী সাহেবের হাতে দিয়ে বলে— ভয় পাবার কিছু নেই।

— তার মানে? বিস্ময়ভরা গলায় বলে ওঠেন মিঃ হারুন। দস্যু বনহুরের চিঠি, অথচ আপনি বলছেন ভয় পাবার কিছু নেই!

ওটা বনহুরের একটা খেয়াল, বিশেষ করে পুলিশ মহলকে সে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে।

আপনি দস্যু বনহুর সম্বন্ধে তেমন কিছু জানেন না, তাই ও কথা বলতে পারলেন। দস্যু বনহুর যে কত ভয়ঙ্কর তা শুধুমাত্র একদিনের লড়াইয়ে অনুভব করতে পারেননি সেদিন কোন বেকায়দায় পড়ে আপনার হাতে----

সে কাবু হয়েছে, কি বলেন? কথাটা বলে হাসে বনহুর।

চৌধুরী সাহেব বলে ওঠেন—সে যাই হইক বাবা, আজ আমি তোমাকে কিছুতেই ছেড়ে দেব না, থাকতেই হবে আমাদের এখানে।

তা কি করে হয় বলুন, বাসায় একটা জরুরী কাজ আছে।

তা রাতের বেলা এমন আর কি কাজ। থেকেই যান মিঃ জামান। কথাটা বিনয়ের সঙ্গে বলেন মিঃ হারুন।

মনিরার মুখের দিকে তাকায় বনহুর। মনিরার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে উঠেছে, করুণ দৃষ্টির মাধ্যমে বনহুরকে সে থাকার অনুরোধ জানায়।

অগ্যতা বনহুর থাকবে বলে কথা দেয়।

চৌধুরী সাহেব কতকটা আশ্বস্ত হন। মিঃ হারুনের মুখেও হাসি ফুটে ওঠে, যাক তবু একজন শক্তিশালী সাহসী ব্যক্তি আজ তাদের সঙ্গী হলো— যদি দস্যু বনহুর এসেই পড়ে, কৌশলে তাকে বন্দী করার সুযোগ হলেও হয়ে যেতে পারে।

❑

গভীর রাত।

সে হোটেল, হোটেলের সম্মুখে একটি গাড়ি এসে থেমে ছিল।

অমনি একটা থামের আড়ালে লুকিয়ে ছিল দুটি ছায়ামূর্তি।

গাড়ি থেকে নামলো সে কাবুলীওয়ালা। অন্ধকারে চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখলো, তারপর দ্রুত হোটেলে প্রবেশ করলো।

ছায়ামূর্তি দুটি অতি গোপনে কাবুলীওয়ালাকে অনুসরণ করলো, হোটেলের বাইরে অন্ধকারে লুকিয়ে রইলো পুলিশ ফোর্স। ছায়ামূর্তি দুটি

অন্য কেউ নয়, একজন মিঃ শঙ্কর রাও, অন্যজন গোপালবাবু। তাঁরা অতি সাবধানে এগিয়ে চলেন।

কিছুদূর এগুতেই শুনতে পেলেন তাঁরা একটা গম্ভীর কণ্ঠস্বর। মিঃ শঙ্কর রাও কান পেতে চেষ্টা করলেন, কোন এক গোপন কক্ষ থেকে আওয়াজ ভেসে আসছে--- একটা লোকের সঙ্গে তোমরা এতগুলো লোক পারলে না, তোমরা কাপুরুষ। যত টাকা লাগে লাগবে, মেয়েটাকে আমার চাই। নইলে মনে রেখ, তোমাদের প্রত্যেককে আমি গুলি করে হত্যা করবো।

একটা ভারী কর্কশ কণ্ঠস্বর— হুজুর, সবাই পালিয়ে গেলেও আমি পালাইনি, শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছি----

পুনরায় পূর্বের কণ্ঠ— আমি কোন কৈফিয়ত শুনতে চাইনে। এবার যদি তোমরা বিফল হও, আমি কাউকে ক্ষমা করবো না।

নির্জন নিস্তব্ধ হোটেলের ভিতরে জেগে উঠলো ভারী বুটের শব্দ। কেউ যেন এগিয়ে আসছে।

জমকালো রিভলবারটা দক্ষিণ হাতে চেপে ধরে দেয়ালে ঠেশ দিয়ে দাঁড়ালেন মিঃ শঙ্কর রাও।

গোপাল বাবু তাঁর কানে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলেন— দস্যু বনহুর এদিকেই আসছে।

হ্যাঁ, তুমি রিভলবার ঠিক রেখে সাবধানে দাঁড়াও।

অন্ধকারে লক্ষ্য করলেন শঙ্কর রাও, হোটেল থেকে বেরিয়ে আসছে সে কাবুলীওয়ালা। অমনি এক লাফে মিঃ শঙ্কর রাও কাবুলীওয়ালার সম্মুখে দাঁড়িয়ে রিভলবার বাকিয়ে ধরলেন, খবরদার, নড়বে না, নড়লেই মৃত্যু।

হঠাৎ এ বিপদের জন্য ঘাবড়ে গেল কাবুলীওয়ালা।

গোপালবাবু ততক্ষণে বাঁশিতে ফুঁ দিয়েছেন।

মুহূর্তে হোটেলকক্ষ পুলিশ ফোর্সে ভরে উঠলো।

ধীরে ধীরে হাত তুলে দাঁড়ালো কাবুলীওয়ালা।

একজন পুলিশ অফিসার তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

মিঃ শঙ্কর রাও অন্যান্য পুলিশকে ইঙ্গিত করলেন হোটেলের ভিতরে প্রবেশ করে দস্যুর অনুচরগণকে বন্দী করতে কিন্তু হোটেলে কোথাও কাউকে পাওয়া গেল না. সবাই যেন হাওয়ায় মিশে গেছে।

মিঃ শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু পুলিশ ফোর্স নিয়ে বীরদর্পে ফিরে চলেন। তাঁদের মনে আনন্দ ধরে না। দস্যু বনহুরকে বন্দী করতে পেরেছেন, এটাই সবচেয়ে বড় আনন্দের কথা।

কাবুলীওয়ালাকে হাজতে বন্দী করে কড়া পাহারায় রেখে মিঃ শঙ্কর রাও যখন বাসায় ফিরলেন, তখন আশ্চর্য হয়ে গেল, পুলিশ ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন তাঁর জন্য অপেক্ষা করছেন।

মিঃ শঙ্কর রাওকে দেখামাত্র মিঃ হারুন বলে ওঠেন— আপনি এসে গেছেন ভালই হলো। এক্ষুণি আপনাকে চৌধুরী বাড়ি যেতে হবে।

কেন?

দস্যু বনহুর চিঠি দিয়েছে, সে নাকি আজ রাতে হানা দেবে।

বলেন কি, দস্যু বনহুর।

হ্যাঁ।

কিন্তু তাকে আমি এইমাত্র হাজতে বন্দী করে রেখে এলাম।

সে কি রকম।

আপনাকে পুলিশ অফিসে না পেয়ে মিঃ আহমদের নিকট পারমিশন নিয়ে পুলিশফোর্স সঙ্গে করে সে হোটেলে হানা দিয়েছিলাম। দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছি। গর্বিতভাবে বলেন মিঃ শঙ্কর রাও।

মিঃ হারুন বিস্ময়ভরাকণ্ঠে বলেন— দস্যু বনহুরকে এত সহজেই গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়েছেন, বড় আশ্চর্যের কথা! চলুন, প্রথমে তাকে একবার স্বচক্ষে দেখে আসি। উঠে পড়েন ইন্সপেক্টার মিঃ হারুন।

চলুন।

দেখুন আপনি এইমাত্র ক্লান্ত হয়ে ফিরলেন, পুনরায় কষ্ট করে--- না না, এতে আমার কিছু মাত্র কষ্ট হবে না।

গাড়িতে উঠে বসেন মিঃ হারুন এবং শঙ্কর রাও।

পুলিশ অফিসে পৌঁছতেই শশব্যস্তে এগিয়ে এলেন সাবইন্সপেক্টার মিঃ কায়সার—স্যার, চৌধুরী বাড়ি থেকে আপনার নিকট ফোন এসেছে। এইমাত্র নাকি দস্যু বনহুরের আর একখানা চিঠি পাওয়া গেছে।

একসঙ্গে বলে উঠেন মিঃ হারুন এবং শঙ্কর রাও— দস্যু বনহুরের চিঠি!

ইয়েস স্যার!

মিঃ শঙ্কর রাও বলে ওঠেন— চলুন দেখবেন, আমি দস্যু বনহুরকে বন্দী করতে সক্ষম হয়েছি কিনা।

চলুন।

আরও কয়েকজন অফিসারসহ মিঃ হারুন এবং মিঃ শঙ্কর রাও হাজত কক্ষে প্রবেশ করলেন। মিঃ হারুন ও মিঃ শঙ্কর রাও এগিয়ে যান কাবুলীওয়ালাবেশী বন্দীর দিকে।

মিঃ হারুন সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে কিছুক্ষণ তাকালেন বন্দীর মুখে, তারপর হেসে বলেন— দস্যু বনহুর এ নয়, মিঃ রাও।

তার মানে?

মানে এই দেখুন। একটানে কাবুলীওয়ালার দাড়ি খুলে ফেলেন মিঃ হারুন

সকলে বিস্ময়ে চমকে ওঠেন। মিঃ শঙ্কর রাও অবাক হয়ে বলেন- একি, এ যে খানবাহাদুর সাহেবের ছেলে মিঃ মুরাদ!

মিঃ হারুন বলে ওঠেন— শিগ্‌গির চলুন, বনহুর হয়তো এতক্ষণে চৌধুরীবাড়িতে হানা দিয়েছে।

আর এক মুহূর্ত বিলম্ব না করে মিঃ হারুন, মিঃ শঙ্কর রাও এবং গোপাল বাবু ছুটলেন চৌধুরীবাড়ির উদ্দেশ্যে। যদিও সেখানে পুলিশ পাহারা রাখা হয়েছে, তবুও তাঁরা নিশ্চিন্ত নন।

কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেল তারা চৌধুরীবাড়িতে। কিন্তু পৌঁছতেই চৌধুরী সাহেব হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন— ইন্সপেক্টার সাহেব, এত কড়া পাহারার মধ্যেও দস্যু বনহুর এসেছিল।

বলেন কি!

হ্যাঁ, আপনি এদিকে পাহারার ব্যবস্থা করে চলে যাবার পর আমি বড্ড ক্লান্তি অনুভব করলাম। তাই একটু বিশ্রামের জন্য নিজের কক্ষে গেলাম, দরজা বন্ধ করে যেমনি বিছানায় শুতে যাব, অমনি আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালো এক ছায়ামূর্তি! কি ভয়ংকর তার চেহারা, রিভলবার উদ্যত করে বলেন সে— ভয় নেই, আমি আপনাকে হত্যা করবো না, কিন্তু আমার একটা কথা আপনাকে রাখতে হবে— একটু থামলেন চৌধুরী সাহেব।

কক্ষের সকলে স্তব্ধ নিশ্বাসে শুনছেন তাঁর কথাগুলো। মিঃ হারুন একবার কক্ষের চারিদিকে তাকিয়ে নিলেন।

চৌধুরী সাহেবের অনতিদূরেই দাঁড়িয়ে আছে মনিরা, তার ওপাশেই আর একটা সোফায় বসে আছে বনহুর। মিঃ হারুন কক্ষে একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নিতেই বনহুরের দৃষ্টি বিনিময় হলো।

চৌধুরী সাহেব বলে চলেন— আমি বললাম, তুমিই দস্যু বনহুর? সে জবাব দিল, হ্যাঁ, আমার কথা না রাখলে মৃত্যু আপনার অনিবার্য। আমি ভয়ে কম্পিতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, বলো তুমি কি বলতে চাও? সে বলেন— সাবধান, মনিরার বিনা অনুমতিতে কখনও তাকে বিয়ে দিতে যাবেন না যেন। কথা শেষ করেই সুইচ টিপে ঘর অন্ধকার করে ফেললো। আমি সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলাম। সবাই যখন ছুটে এলো, আলো জ্বেলে দেখি কোথায় বনহুর, কেউ নেই!

মিঃ হারুন গম্ভীরকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন—হুঁ।

মিঃ শঙ্কর রাও বলে ওঠেন— আপনার ভাগ্নির বিয়েতে মতামত সম্বন্ধে দস্যু বনহুরের কি স্বার্থ থাকতে পারে?

চৌধুরী সাহেব বলেন— নিশ্চয়ই বনহুরের দৃষ্টি আমার মনিরার উপর পড়েছে।

সে কথা মিথ্যে নয়, চৌধুরী সাহেব। এ না হলে সে এখানে আসতে যাবে কেন? সত্যি আমি বড় দুঃখিত, নিজে থেকেও তাকে গ্রেপ্তার করতে পারলাম না। কথাগুলো বলেন দস্যু বনহুর।

না, না, এতে দুঃখ করার কিছু নেই বাবা! তুমিই বা এ অবস্থায় কি করবে। চৌধুরী সাহেব বনহুরকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন।

মিঃ হারুন হঠাৎ গম্ভীরকণ্ঠে বলে ওঠেন— চৌধুরী সাহেব, বনহুরকে আজ আমি গ্রেপ্তার করবোই।

সকলেই বিস্ময়ভরা নয়নে তাকালেন মিঃ হারুনের মুখে।

মিঃ হারুন তেমনিভাবেই বলেন— সে এ কক্ষেই বিদ্যমান। একসংগে বলে ওঠেন— বলেন কি!

মনিরা ভয়ার্ত চোখে তাকালো কক্ষের চারিদিকে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো বনহুরের পাশে। সবচেয়ে নিরাপদ স্থান যেন ওর ওটা।

মিঃ হারুন ঠিক সে মুহূর্তে রিভলবার বের করে উদ্যত করে ধরলেন বনহুরের দিকে এবং পুলিশদেরকে বলেন— ঐ ভদ্র যুবককে গ্রেপ্তার কর।

মনিরা স্তব্ধ নিঃশ্বাসে তাকালো বনহুরের মুখে। বনহুরও একবার তাকিয়ে নিল মনিরার মুখের দিকে। তারপর চোখের পলক মাত্র; আচমকা এক ঝটকায় মিঃ হারুনের হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিয়ে লাফিয়ে ছিল মুক্ত জানালা দিয়ে বাইরের অন্ধকারে।

পুলিশ ফোর্স একসঙ্গে গুলি ছুঁড়লো— গুড়ুম গুড়ুম। কতকগুলো পুলিশ ছুটলো অন্ধকারে।

মনিরার মনে তখন ঝড়ের তাণ্ডব বইতে শুরু করেছে। কম্পিত প্রাণে সে আল্লাহকে স্মরণ করলো— হে আল্লাহ, ওকে তুমি বাঁচিয়ে নাও। ওকে বাঁচিয়ে নাও!

চৌধুরী সাহেব ঘ মেরে গেছেন। তাঁর শুষ্ক কণ্ঠ দিয়ে বেরিয়ে এলো— এ কি করে সম্ভব হয়? মনে মনে একটা গভীর ব্যথা অনুভব করেন। চোখ দুটো কেমন যেন ঝাপসা হয়ে আসে।

মিঃ হারুন হাবা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি হতভম্ব হয়ে ছিল। এর জন্য তিনি মোটেও প্রস্তুত ছিল না। এত দ্রুত তাঁর হাত থেকে বনহুর রিভলবার ছিনিয়ে নিয়ে জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ল যে, কিসে কি হলো মিঃ হারুন বুঝতেই পারলেন না। চেহারা তাঁর বিবর্ণ হয়ে উঠেছে। দস্যু বনহুরকে এত নিকটে পেয়েও হারালেন!

মিঃ শংকর রাও হেসে বলেন— ইন্সপেক্টার সাহেব, দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করা যত সহজ মনে করা যায়, তত সহজ নয়।

মিঃ হারুন বলে ওঠেন— কিন্তু আমি দেখে নেবো দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তার করতে পারি কিনা! কথাটা বলে কক্ষ থেকে বেরিয়ে যান মিঃ হারুন। অন্যান্য পুলিশ অফিসার এবং পুলিশগণ তাঁকে অনুসরণ করে।

❑

গোটারাত মনিরার অনিদ্রায় কাটলো। পরদিন ভোরে চায়ের টেবিলে বসে কন্যা সমতুল্যা ভাগনীর চেহারা লক্ষ্য করে চৌধুরী সাহেব বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে ছিল। তিনি জানেন, মনিরা জামানকে কত ভালবাসতো। চৌধুরী সাহেব নিজেও কম ভালবাসেন কি! অমন চেহারা, অমন ব্যবহার, কে না তাকে ভালবেসে পারে! কিন্তু সে যে সে ডাকাত শুধু। ডাকাত নয়, দুর্দান্ত দস্যু বনহুর যার ভয়ে আজ গোটা দেশবাসী কম্পমান। না না, তাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না চৌধুরী সাহেব। যতই সে ভাল হউক, যতই সে মহৎ হউক তবু সে দস্যু। শাস্তি তার পাওয়া উচিত।

চৌধুরী সাহেব মনিরার মনকে প্রফুল্ল করার জন্য হেসে বলেন— মনি, চল মা সকাল বেলাটা কোথাও থেকে ঘুরে আসি। আজ ক'দিন থেকে তোমার মামীমাও বেড়াতে যাব বলছেন।

মনিরা চায়ের খালি কাপটা টেবিলে নামিয়ে রেখে গম্ভীর কণ্ঠে বলেন— মামুজান, আজ আমার যে এক বান্ধবীর বাড়ি যাবার কথা আছে। হাতঘড়ির দিকে তাকায় মনিরা, তারপর উঠে দাঁড়ায়।

চৌধুরী সাহেব বুঝতে পারলেন, মনিরা নিশ্চয়ই সে দস্যু বনহুরের সঙ্গে দেখা করতে যাবে। একদিন কথায় কথায় তিনি মনিরার নিকটে শুনেছিল শহরের শেষ প্রান্তে জামানের বাড়ি। রাস্তার নাম এবং নম্বরটাও তাঁর স্পষ্ট মনে আছে। মনে মনে হাসলেন চৌধুরী সাহেব। এমন একজন দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়ে দিতে পারলে শুধু তাঁর সুনাম হবে না, এতে কৃতিত্ব আছে অনেক।

মনিরা কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতেই চৌধুরী সাহেব স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বলেন— জানো মরিয়ম, মনি এখন কোথায় গেল?

মরিয়ম বেগম বলেন— মনি তো বলেই গেল তার কোন বান্ধবীর বাড়ি যাবে সে।

না গো না, মনি গেল সে দস্যুটার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

তুমি জানলে, অথচ বাধা দিলে না?

না, আমি বাধা দেব না; বরং তার সাক্ষাতে আমি দস্যু বনহুরকে পুলিশের হাতে তুলে দেব!

এসব তুমি কি বলছো?

হ্যাঁ মরিয়ম, মনিরা ছদ্মবেশী ভদ্রযুবক দস্যু বনহুরকে ভালবেসে ফেলেছে। শুধু ভালবেসেছে নয়, তাকে সে গোটা অন্তর দিয়ে কামনা করে আসছে।

দেখ শুধু কি মনিরাই তাকে ভালবেসেছিল। কি জানি, আমার গোটা মনটাও যেন সে অধিকার করে বসেছিল। সত্যি সে যে দস্যু, একথা আমি এখনও ভাবতে পারিনে। আমার মনটা কেমন যেন ব্যথায় গুমড়ে কেঁদে উঠছে। বাষ্পরুদ্ধ হয়ে আসে মরিয়ম বেগমের কণ্ঠ।

চৌধুরী সাহেবের হৃদয়ে ব্যথার আঁচ লাগে। তিনি গম্ভীর গলায় বলেন— কি যাদু জানে সে, কে জানে। কেন যে ওকে এত ভালো লাগতো আমি নিজেও বুঝি না। যাক শুনো মরিয়ম, আমি এক্ষুণি পুলিশ অফিসে যাব।

কেন? আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করেন মরিয়ম বেগম।

দস্যুকে আমি কিছুতেই ক্ষমা করতে পারিনে, যতই মহৎ, যতই উদার হউক সে, যতই গুণ তার থাক, তবু সে দস্যু। আমার কর্তব্য তাকে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেয়া।

কি হবে তাকে পুলিশে দিয়ে! তা'ছাড়া তোমার তো এতে কোন স্বার্থ নেই? আমি জানি সে যত বড় দস্যু হউক, আমাদের কোন ক্ষতিই সে করবে না কোনদিন।

আমাদের ক্ষতি সে নাও করতে পারে। তবু চোর-ডাকাত এদের কোন বিশ্বাস নেই। বিশেষ করে দেশবাসীকে ঐ দস্যুর হাত থেকে আমাকে বাঁচাতেই হবে। উঠে দাঁড়ালেন চৌধুরী সাহেব।

মরিয়ম বেগম বলেন— কোথায় চললে?

ঐ তো বললাম পুলিশ অফিসে। মিঃ হারুন এবং পুলিশ ফোর্স নিয়ে এক্ষুণি আমি জামানের বাড়ি যাব।

কিন্তু----

মনিরা সেখানে আছে, এই তো?

হ্যাঁ।

সে কথা আমি সব বলে নেব হারুন সাহেবকে। মনিরাকে পাঠিয়ে আমি যেন তাকে গ্রেপ্তারের সুযোগ করে নিয়েছি।

ওগো, আমিও যাব তোমার সঙ্গে। মনিরাকে আমি নিজে গিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে আসবো।

তবে তৈরি হয়ে নাও। এক্ষুণি বেরুবো, আমার মনে হয় সে এখনও বাড়িতে আছে। কারণ সে মনিরার জন্য অপেক্ষা করবেই।

❑

মনিরা কক্ষে প্রবেশ করতেই বনহুর উঠে দাঁড়ালো। মনিরা গম্ভীর দৃষ্টি নিয়ে তাকালো বনহুরের মুখের দিকে। বনহুর এগিয়ে এলো মনিরার পাশে। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরবে কাটলো।

বনহুরই প্রথমে কথা বলেন— আমি জানি তুমি আসবে, তাই আমি এতক্ষণ তোমার প্রতীক্ষায় আছি।

মনিরা নীরব।

বনহুর ওর চিবুক উঁচু করে ধরলো—মনিরা কি ভাবছো? খুব ঘৃণা হচ্ছে বুঝি?

এতক্ষণে মনিরা কথা বলেন— আমি তোমাকে ঘৃণা করি না, ঘৃণা করি বনহুরকে। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এ আমি ভাবতেও পারি না জামান, তুমি দস্যু বনহুর।

মনিরা, মনিরা--- রুদ্ধ নিঃশ্বাসে বনহুর মনিরাকে টেনে নিল কাছে।

মনিরা বনহুরের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে সরে দাঁড়ালো— তুমি আমাকে স্পর্শ করো না।

মনিরা!

হ্যাঁ, তুমি অপবিত্র ঘৃণিত একটা মানুষ---

মনিরা, তুমি বিশ্বাস করো আমি অপবিত্র ঘৃণিত নই। আমি দস্যু নই। দস্যুতা আমার পেশা নয়। মনিরা তুমি আমাকে ঘৃণা করো না। পুনরায় বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় কাছে।

না না, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও--- তোমার সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক নেই, আমি চললাম।

না, তোমাকে আমি যেতে দেব না। মনিরাকে দক্ষিণ হাতে শক্ত করে ধরলো বনহুর। আরেক হাতে এক ঝটকায় নিজের জামার নিচে গলা থেকে সে হারছড়া টেনে বের করে মেলে ধরলো মনিরার সামনে— চিনতে পার এই ছবি দুটি কাদের?

বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠলো মনিরা— এ ছবি তোমার গলায় এলো কি করে? এ যে আমার আর মনিরের ছবি।

বনহুর তখন মনিরাকে ছেড়ে দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন— তোমাদের সে হতভাগ্য মনির আর কেউ নয়— দস্যু বনহুর।

মনিরা আর্তনাদ করে উঠলো— জামান, তুমিই মনির? কেন- কেন তুমি এসব করতে গেলে?

বনহুর মনিরাকে নিবিড়ভাবে বুকে চেপে ধরলো, তারপর বলেন— এই আমি তোমাকে স্পর্শ করে বলছি মনিরা, আর আমি দস্যুতা করবো না।

ঠিক সে মুহূর্তে মিঃ হারুনসহ চৌধুরী সাহেব কক্ষে প্রবেশ করলেন। তাঁদের পেছনে পুলিশ ফোর্স।

সঙ্গে সঙ্গে মনিরাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো বনহুর। বুঝতে পারলো সে, তার পিতাই আজ তাকে পুলিশের হাতে সপে দেয়ার জন্য আয়োজন করেছেন। পালালে সে এক্ষুণি পালাতে পারে। তার পায়ের তলাতে আছে এক চোরা সুড়ঙ্গ। এখনই সে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে, কিন্তু এ যে তার পিতাকে অপমান করা হবে।

মনিরার চোখেমুখেও বিস্ময়, হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।

মিঃ হারুন এগিয়ে গেল বনহুরের দিকে। বনহুর হাত দু'খানা বাড়িয়ে দিল।

মিঃ হারুন নিজ হাতে বনহুরের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

মনিরা আর্তনাদ করে চৌধুরী সাহেবের জামার আস্তিন চেপে বলেন- মামুজান, এ তুমি কি করলে? এই দেখো--- মালাছড়া চৌধুরী সাহেবের হাতে দিল মনিরা।

এমন সময় চৌধুরী সাহেবের গাড়ি থেকে নেমে এলেন মরিয়ম বেগম। কারণ মনিরার আর্তচিৎকার তার কানে পৌঁছে ছিল, ভাগ্নীর কোন অমঙ্গল আশঙ্কা করেই তিনি ছুটে এলেন।

চৌধুরী সাহেব মালাছড়া হাতে নিয়েই চিনতে পারলেন। এ মালা যে তার অতি পরিচিত। তিনি কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে মালার লকেটের ছবি দুটির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন—এ মালা তুই কোথায় পেলি, মনিরা।

মনিরা আংগুল দিয়ে বনহুরকে দেখিয়ে বলেন— ওর গলায়।

অবাক হয়ে তাকান চৌধুরী সাহেব বনহুরের দিকে।

মনিরা বাষ্পরুদ্ধ গলায় বলে— মামুজান, ঐ তোমাদের সন্তান মনির।

চৌধুরী সাহেব এবং মরিয়ম বেগম স্থির নয়নে দেখতে লাগলেন বনহুরকে। তাঁদের চোখের সামনে বনহুরের মুখ মিশে গিয়ে সেখানে ফুটে উঠলো একটা শিশু মুখ।

মরিয়ম বেগম ছুটে গিয়ে বনহুরকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে— বাবা মনির! আমার মনির----

চৌধুরী সাহেবের গণ্ড বেয়ে ঝর ঝর করে তখন ঝরে পড়ছে অশ্রুধারা। মনকে তিনি কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারছেন না।

মরিয়ম বেগম উচ্ছ্বসিত কান্নায় ভেংগে ছিল, স্বামীকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন— ওগো, কি করলে তুমি? হারানো রত্ন ফিরে পেয়ে আবার তুমি হারালে। না না, আমি মনিরকে কিছুতেই দূরে নিয়ে যেতে দেব না। দেব না--- মনির আমার মনির---- পুত্রের বুকে মাথা ঠুকে কাঁদতে লাগলেন মরিয়ম বেগম।

মিঃ হারুন কঠিন কণ্ঠে বলেন—বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বনহুরের শান্ত ধীরস্থির গলায় বলেন— চলুন, ইন্সপেক্টার সাহেব।

সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরী সাহেব পুত্রের হাত চেপে ধরে কেঁদে উঠলেন— বাবা মনির!

বনহুর হেসে বলেন— আব্বা, আপনার কর্তব্য আপনি পালন করেছেন।

একবার মা ও মনিরার দিকে তাকায় বনহুর, উভয়ের চোখেই পানি, বনহুরের চোখ দুটোও অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠলো।

মনিরা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলো— মনির, আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকবো!